banglabooks.in

কায়াহীনের কাহিনী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

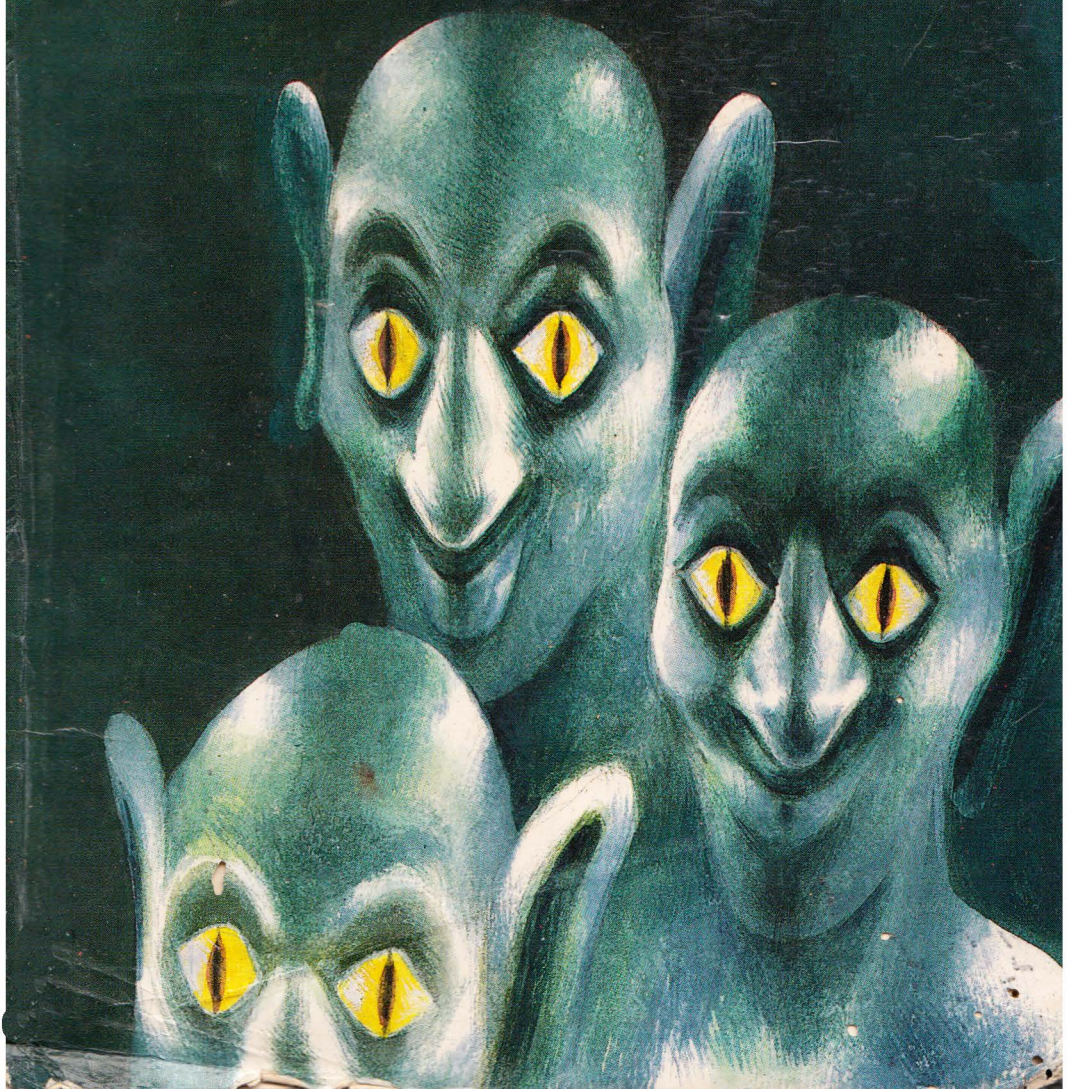

banglabooks.in

কায়াহীনের কাহিনী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শিশু সাহিত্য সংসদ

banglabooks.in

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত চৌধুরী

প্রথম সংসদ সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৯৪

ISBN 81-85626-61-8

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

banglabooks.in

সূচিপত্র

হরতনের গোলাম	৭
বাঁশির ডাক	২৪
লাট্টুর ঘূর্ণি	৪৯
কঙ্কালের টঙ্কার	৬০
অতিথির আবদার	৭৮
খোট্টাই শরবত	৯৪

banglabooks.in

banglabooks.in

হরতনের গোলাম

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প—বোধ হয় তেরো-চোদ্দো।

বৃন্দাবন, ডাক নাম বিনু, ছিল আমার সবচেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তাম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতাম, সে ছাড়া আর কারও সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগত না। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ওই খেলা শিখিয়ে দিল। দু জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠল। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতাম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখাপড়ার প্রাইজে, খেলাধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে। এমন কী নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনওদিন তাকে জিততে পারিনি—সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি খেয়েছে। এক এক

banglabooks.in

সময় সন্দেহ হত আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিল। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদরবাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবতখানার নিচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতাম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানি না। এ বাড়ি যখন জমজমাট ছিল, তখন হয়তো কর্তাদের সানাইওয়ালারা এইখানেই বসবাস করত। এখন এখানে দিনে রাতে কারও পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপিচুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই বন্ধুর ভারি মনের মতো ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভেতরকার তাড়াহুড়া এসে পৌঁছতে পারত না ; আমরা দুজনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গলগল করতে পারতাম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ওই ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এর কোনও আভরণ ছিল না—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। নইলে সেই কঙ্কালসার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে এনেছিল—বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস জোড়াটা ছিল খুবই পুরনো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেকদিন ধরে অনেক চড়চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে টেনে এমন ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতাম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি ?—কে জানে !

banglabooks.in

তাঁর এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত ; সেইজন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতাম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতাম—আস্তে আস্তে তুলতাম, আস্তে আস্তে ফেলতাম, ভাঁজতাম খুব আলগা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতাম অতি যত্নে। সত্যি বলছি এই তাসকে এত ভালোবাসতাম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনওদিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হত—এরা যেন এককালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না ; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হত ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুরদার দরোয়ান এ ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন একরকমের। এক একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হত আমি যেন তাদের ওই ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে !—যারা অনেক কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে ! সেখানে কী দেখতাম, কী শুনতাম মনে নেই কিন্তু সেসব দেখে-শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতাম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতাম। সে ধমক দিয়ে বলত—"কী বসে বসে ভাবছিস ?—খেল না !" আমি অমনি তাড়াতাড়ি যাহোক একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতাম। কিন্তু বুকটা কেমন ছমছম করতে থাকত। মনে হত এ নিশ্চয় যাদুকর তাস !

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলতরে বিনু ?" বিনু বলেছিল—"শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন ; কেউ নাকি তাঁকে তাস খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলত, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাস।" বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি ; তার মামাদেরই দেখতাম খুব বুড়ো ! উঃ, তাহলে না জানি তিনি কত বুড়ো ! এ সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়োর হাতের গুণ করা তাস ! এ তাস ছুঁতে বুক ছমছম করত, কিন্তু তবু

banglabooks.in

ভালোবাসতাম বিনুর দেওয়া এই তাস জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলত। তাকে খেলায় জিততে পারতাম না বলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলত—"জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ করা তাস ! এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না—তুইও না !"

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গোরুর চোখের মতো একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলত—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো করে ; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকত—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠত। একে একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসত। চৌধুরিবাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে এক ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়ত, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত। গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠত জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে শুনতাম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি হাতে খড়ম পায়ে—খট-খটাস ! খট-খটাস। তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক ফেটে কাতরে উঠত—কেঁই-কেঁই ! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আমাদের ঠাকুরদার আমলের পুরোনো ঠাকুরদালানের কালপ্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখন হুস্‌হুস্‌ কখন হিসহিস শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান করে দিত এবং মাঝে মাঝে ফটফট করে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত ! ওই বুঝি সে এল ! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামত না ! বিনু ধমক দিয়ে বলত—"কী করছিস ? খেল না !" তার এই ধমকানিতে আমার চটকা ভাঙত। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ওই বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হত তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতাম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতাম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড় বৃষ্টি এল। একটা

banglabooks.in

ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উলটে পালটে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বলল—"মল্লি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে !" আমি উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলাম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেকহ্যান্ড করে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলাম—কিছু বুঝতে পারলাম না। বুকটা ধুকধুক করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলাম। আশ্চর্য কাণ্ড ! যা কখনও হয়নি, তাই হল। বিনুও অবাক। সে একটু বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসল। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারল না। আমার কেমন সন্দেহ হল—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি !

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলাম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোনও বাহাদুরি নেই। প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায়। কে যেন ম্যাজিক করে ভালো ভালো তাসগুলো বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল—"আজ আমার পড়তা খারাপ পড়ল দেখছি !" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজল ! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগল—"আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।" আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলাম ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আজকের ওই ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে !

বিনু ফেলল হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললাম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হল। পরের হাতে আমি খেললাম চিঁড়ের দশ। আমি জানতাম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে। বিনু ফেললও গোলাম, কিন্তু আমার দশখানা হঠাৎ দু ফোঁটা চুরি করে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

banglabooks.in

আমি অবাক ; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। সে বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইসকাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ বড়-হয়ে যাওয়া চোখ দুটো কেমন একরকমভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইল যে সে চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিমঝিম করে এল।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললাম—"ভাই, আর খেলে কাজ নেই, চলো যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুলল না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। মনে হল বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে। আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে—এর দরজা জানালা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়িকাঠের খোপে খোপে চড়াই পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ! আমিও তার সঙ্গে দুলতে লাগলাম—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম !

হঠাৎ চটকা ভাঙল চৌধুরিবাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং ! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কী ? ও কীসের শব্দ ? কড়িকাঠের কাছে ওই কোণের গর্ত থেকে কে এমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হূউউউসসস !— হূউউসস ! আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কীসের শব্দ ভাই ?"

বিনু কথা কইল না। শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়ি কাঠের দিকে চাইল, আর আমার মনে হল তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে এঁটে রইল—জ্বলজ্বল করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বললাম—"ভাই আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

বিনু বলল—"আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।" আমি চমকে উঠলাম—তার

banglabooks.in

গলা শুনে। কী গম্ভীর আওয়াজ ! এ তো কোনও রকমে এই দুহাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি ! কোনও দিকে কান দেবার, কোনও দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে একমনে খেলতে লাগলাম।

সে হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কী করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বলে উঠল সেই রকম বিষম ভারী গলায় ঘর কাঁপিয়ে—"গোলামটা আছে তো ?"

ভয় হল ধরা পড়ে গেছি। বাঁ হাতের তাসের সারি থেকে চট করে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই ; বিনুও নেই। অ্যাঁ ! বুকটা ধক করে উঠল। এ পাশ ও পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলাম ! গা হাত পা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিলখিল শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরের নহবতখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠল। আমি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। মনে হল আমার হাত পায়ের সমস্ত খিল যেন আলগা হয়ে গেছে—উঠে হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগল—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল ? উপর থেকে ভাঙা কাঁশিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগল—কই না না ! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলাম—বিনু, বিনু ! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভেতর চলে গেল—ঘুরতে ঘুরতে, গোঁ-গোঁ শব্দে !

একবার আশা হল বিনু হয়তো বাইরে গেছে—এখনই আসবে। কিন্তু বাঁ হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে ? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একী যেমন খিল বন্ধ করেছিলাম, ঠিক তেমনই আছে।

banglabooks.in

তবে ? তবে সে কেমন করে বাইরে গেল ?

হঠাৎ মনে হল বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো ?

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পিছনে বড়জোর আঙুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারেনা। তবু সেখানটা একবার দেখলাম। ঘরের একোণ ওকোণ এধার ওধার প্রদীপ ধরে দেখলাম তন্নতন্ন করে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই !

কতক্ষণ পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। কেবল আমাদের তিনমহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলাম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; যেন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ! চৌধুরিদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কী হল রে, কী হল ? কোথায় গেল ?" পশ্চিম কোণের ঢ্যাঙা সুপুরিগাছটা কিছু না বলে শুধু ডিঙি মেরে আকাশের দিকে মুখ তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিল—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত বড় কালো পাখি তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে ! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বলে উঠল—"আ হা হা !" অমনি আমার বুকের ভিতরটা করে উঠল—"আহাহা ! বিনুকে ওরা ভেলকি বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল !"

ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনের থেকে যেন সব একে একে মুছে আসতে লাগল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলাম—পলে পলে, তালে তালে ! তারপর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এল তাস পেটার শব্দ—চটাস-চটাস ! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে ? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ

banglabooks.in

হয়ে গেল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

বারান্দার পশ্চিম কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনাঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা ছমছম করে, সে জন্য এদিকটা আমরা কেউ মাড়াতাম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ওইখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ওই মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল সন্ধ্যায় আলো গঙ্গাজল পড়ত না—ঝাঁটাও কেউ দিত না। এই খাজনাঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না—বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হত—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর। সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁতসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালিঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিনরাত ঘূর্ণির মতো ঘুরছে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়নি। কারণ বহুদিন হল আমাদের সে জমিদারি নেই ; তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুমার মখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি দাদামশাই ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমনকী নিজের ছেলেমেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা করে চলতেন। লোকে টাকা খরচ করে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ করে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণাকড়িও বার হবার জো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্তবড় গল্প! কেমন করে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, কেমন করে তাকে লাল চেলির গরদ পরিয়ে,

banglabooks.in

কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ওই অন্ধকার খাজনাঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়াঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর কিছু নেই, আর কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তার পর ওই চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ মন পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল আসত—বুক দুরদুর করত ; আমার ঠাকুরদাদার সেই পাষণ্ড ঠাকুরদাদার উপর রাগ হত। ঠাকুরমা বলতেন—"আহা, ওই সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা বাবা করে বুক ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করেছে, তবু কেউ তাকে ওই চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসত। তার পর খিদে তৃষ্ণায় ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ওইখানে বসে বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারও সাধ্য নেই যে ওই টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে ! আমার ঠাকুরদাদার বাবা নাকি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি ; মেজের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল ; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হল, কেউ জানে না। তিনি নিজেও কিছু বলেননি ; কারও সাহসও হয়নি জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ওই ঘরের দিকে আর কেউ যায় না। মনে হল ওই খাজনাঘর থেকেই যেন তাসখেলার শব্দ পেলাম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগল, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলাম না, যদি সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে !

বুকটা দু হাতে চেপে খাজনাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোহার গরাদ-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলাম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেল না, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দু-ধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায় মাথা অনবরত ঠোকাঠুকি করছে—দুম, দুম, দুম ! আমার কেমন মনে হল যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই

banglabooks.in

ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি এক মনে এদের লড়াইয়ের তাল গুনছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলাম। সে বলছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠল—"দূর বোকা, তা কখনও হয় ? গোলাম হল সাহেব বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম ; হলই না হয় সে রঙ মেখেছে !"

গোড়ায় গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলাম—"গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু ?" বিনু বলেছিল—"এই রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলাম—"তুই কিচ্ছু খেলতে পারিস না ! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।" বিনু আমায় ডাকত মল্লি বলে। মনে হল, আমার যখন নাম করছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু ! বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ওই ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগল, কিন্তু পারলাম না। ভয় হল, পাছে ওই দুটো পাগলা ভূতের মাথা ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁতলে যাই ! আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—"অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল ? হরতনের গোলাম ! ভারি আশ্চর্য ! এই ছিল, এই নেই ! চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই উড়ে গেল ?"

আমার ভারি হাসি পেল—ওই যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি !

বিনু বলে উঠল— "হরতনের গোলাম ?—সে তো মল্লির হাতে।" আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যই তো সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলাম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো !

অন্য লোকটা বলে উঠল—"কই হ্যায়—মল্লিবাবুকো পকড় লে আও !"

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনাঘরের ভিতর ছুড়ে দিয়ে এক ছুটে নিজের শোবার ঘরে পালিয়ে এলাম।

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধকধক করতে লাগল—এই বুঝি সে এসে আমায়

banglabooks.in

জাপটে ধরে নিয়ে যায় ! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। খানিকক্ষণ কেউ এল না, তারপর কে একজন খসখস শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারল না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক করে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠল। আমি ভয়ে কাঠ ! যে এল, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল। তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগল—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে ! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলাম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলাম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল। আমার পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না তো ? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। খনিকক্ষণ চুপ করে রইল, বোধ হয় কী ভাবল, তারপর আমার পাশে এসে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। সর্বনাশ ! এখন করি কী ! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি বেড়ালটা ম্যাঁও শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এল—তাহলে সত্যিই কী বিনুকে ওরা ওইখানে—ওই চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল ! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কী করে ? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপিচুপি ডাকল—"মল্লি ভাই, মল্লি ! বিনুর কাছে যাবে ? বিনুর কাছে।"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম—বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগল—যদি আর ফিরে আসতে না পারি ?

সে তখন বলল—"ভয় কী ! চলো না ! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিনুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলতে লাগলাম—"ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।"

banglabooks.in

আমার কান্না শুনে সে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলাম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসতাম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দারোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, অল্প অল্প তার চেহারা মনে পড়ে। কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি করে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কী মিষ্টি লাগত সে রসমুণ্ডি ! এখন যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হল, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দারোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি হাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি করে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল ; ঘরের ঘড়িটা টকটক শব্দ করতে করতে কতদূর চলে গেল। মনের মধ্যে কত ভাবনা এল গেল—তবু বিনু এলনা। হায়, সে কি আর আসবে ? ওই ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার করে আনবে ? ভাবতে ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিল। আর অমনি এক নিমেষে মনে হল, আমি যেন একখানা তাসের ওপর শুয়ে কোথায় চলেছি— হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ভেসে !

তাসখানা ভাসতে ভাসতে এসে আমায় একটা চারদিক আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিল। দেখলাম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক মনে তাস খেলছে। বিনু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিনুর ছোট ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগল, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখল না। আমার ভারি রাগ হল—হিংসেও হল। এরই মধ্যে দুজনের এত ভাব ! আমি মুখ গোঁ করে রইলাম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করল—"এ

banglabooks.in

banglabooks.in

কে, বিনু ?"

বিনু গম্ভীর গলায় বলল—"ও মল্লি !"

সে বলল—"বেশ হল। আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব !"

আমি রেগে চিৎকার করে উঠলাম—"না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না !"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে করে তুলে নিল। বিনু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিনু বলল—"দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে যাব।"— বলে সে ছেলেটির কানে কানে কী বলল। ছেলেটি বলল— "চলো, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ করে পড়ে গেল। দিনরাত এক জায়গায় বসে থেকে থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাসগুলোকে কী বলল, তারা ফরফর করে উড়ে এসে পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়াল। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়িকাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ।—আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি ! আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। চারদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল !—যেন আমরা পালাতে না পারি ! ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—"বিনু, দেখেছিস তো, এরা অমায় যেতে দেবে না ! তোরা কেন প্রাণে মরবি ? পালা !" বিনু বলল—"না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।" চামচিকে দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস করে উঠল। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। চামচিকেটা তার ধারাল নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালাল। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলাম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিমসিম খাচ্ছে ! আমি তাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলাম—"বিনু, আয় আয় !" বিনু আমার দিকে ফিরেই

banglabooks.in

চাইল না ; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমার কান্না পেতে লাগল ! তাসগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তারপর কী হল জানি না !

"মল্লি ! মল্লি"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম ! ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠল। মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলাম—"বিনু, এসেছিস ভাই, এসেছিস ?"

সে বলল— "আসব না তো কী ! তুই স্টুপিড এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন ?"

আমি বললাম—"কখন এলি ভাই !"

সে বলল—"অনেকক্ষণ ! তোকে ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কী ? চোখ অমন রাঙা কেন ?" আমার ধাঁধা লাগল। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম—"কাল রাত্রে তুই খেলতে খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—"

সে বাধা দিয়ে বলল—"আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব ? তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।"

আমার আরও ধাঁধা লাগল। একী ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলাম ! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন ? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বলে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করে নিই, কিন্তু পারলাম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল যে বলতে লজ্জা হল। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে !

বিনু বলল—"কী ভাবছিস ? চল বাইরে যাই।"

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো ; সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত বিক্ষত ! তাদের বুকের উপর কে যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের পর আঁচড় টেনেছে।

banglabooks.in

বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বললাম—"বিনু দেখছিস !"

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"আমারই জন্যে তাসগুলো গেল !"

"আঁ ! তোমারই জন্যে ? তার মানে ?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ? তা হলে তো সবই ঠিক !" কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কী করে এমন হল বিনু !" বিনু কোনও জবাব দিল না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিল।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরশোলা ফরফর করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ডানা মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল— বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম।

বিনু বলল—"তাসগুলো কুড়ো !"

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম !

তবে ?

এই তো ঠিক মিলছে ! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রে ওই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন ? সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে আমি জানি। সে আছে, সেইখানে—সেই চারদিক বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয় বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম ! এমন তো আমারও এক একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তাম, তা হলে আমিও হয়তো সব ভুলে যেতাম। আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতাম—তাই তো হরতনের গোলাম বেচারা গেল কোথায় ?

banglabooks.in

বাঁশির ডাক

আমার ছেলেবেলার জীবনে আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে। শুনলে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না।—কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

তখন বিনুর সঙ্গে আমার ভাব হয়নি। পুঁটুই তখন আমার একমাত্র বন্ধু।

আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, সে পাড়ার সবচেয়ে বড় মানুষ ছিলেন চৌধুরি বাবুরা। মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত গাড়িজুড়ি, মস্ত তাঁদের নাম ডাক। তাঁদের নহবতখানায় রোজ সকাল সন্ধ্যা নহবত বাজত—আমার বেশ মনে পড়ে সেই বাজনার শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙত, আর ঘুম থেকে উঠে সকালের আলো সকালের বাতাস ভারি মিষ্টি মনে হত। এঁদের বাড়িতে এক প্রকাণ্ড পেটা ঘড়ি ছিল, কী গম্ভীর তার আওয়াজ—সে আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কত দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেত! ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ঘড়ি বাজত—ঠিক সময়টিতে, কোনও দিন একটু ব্যতিক্রম হত না। এক একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে এই ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছোট মনটি বুক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে দূর দূরান্তর চলে যেত—বুঝি আকাশের সেই শেষ কিনারায়।

banglabooks.in

প্রত্যহ ইস্কুল যাবার সময় এই চৌতালা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যেতাম। মনে হত এ যেন কোনও গল্পে শোনা স্বপ্নে দেখা কাদের ইন্দ্রপুরী ! প্রকাণ্ড লোহার ফটক—তার সামনে মস্ত পাগড়ি মাথায় এক লম্বা সেপাই। অনবরত এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। তার হাতের চকচকে ধারালো সঙিনটা রৌদ্রের আলোয় থেকে থেকে ঝকঝক করে উঠত। মনে হত, যে ওই বাড়িতে ঢুকতে যাবে ওই সঙিনের খোঁচায় সেপাই তাকে গেঁথে ফেলবে। বাড়ির চারপাশ মোটা মোটা উঁচু লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা— যেন কেল্লা বন্দি ! সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও উঠোনের একটুখানি ফালি, কোথাও পাথরে বাঁধানো একটু রোয়াক, কোথাও বাগানের একটু টুকরো দেখা যেত। এক জায়গায় দেখতাম সারি সারি রকম বেরকমের আট দশটা ঘোড়া বাঁধা— যেমন ঝকঝকে তাদের রঙ তেমন সুন্দর তাদের চেহারা, তেমনই তেজালো ! একবার ছাড়া পেলেই যেন তিরবেগে ছুট দেয় ! মনে হত অনেকখানি তেজ যেন আটকা পড়ে ছটফট করছে। —তাদের সেই ছটফটানি তাদের পায়ের তলাকার পাথরের মেঝেতে খটখট শব্দে বেজে উঠে চারদিকে আগুনের ফিনকি ছড়াত। তারই পাশে ছিল মোটা মোটা লোহার শিকলে বাঁধা লিকলিকে সরু পা, ছুঁচোল মুখ এক সার কুকুর। ফোঁস ফোঁস শব্দে অনবরত মাটি শুঁকছে—একটু রক্তের গন্ধ পেলেই যেন লাফিয়ে পড়বে। এই ঘোড়াশালের ঘোড়া দেখতে দেখতে ভাবতাম হাতিশালটা কোথায় ? কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও খুঁজে পেতাম না ; বোধ হয় ওই কোণের দিকে ছিল ! লোহার ফটক পেরিয়ে খানিক দূর গেলেই ছোট্ট একটি বাগান—সুন্দর কেয়ারি করা ! চারধারে ফুলের গাছ, তার মধ্যিখানে ময়ূরের প্যাখম ছড়ানো পিঠ দেওয়া এক সোনালি সিংহাসন। সকালে দেখতাম এই সিংহাসন খালি কিন্তু বিকেলে যখন পুঁটুদের বাড়ি আমি বেড়াতে যেতাম, তখন দেখতাম এই সিংহাসনে বসে একটি সুন্দর ছেলে—ঠিক যেন রাজপুত্তুর ! বয়েস তার আমার চেয়ে কম। আমার চেয়ে রোগা কিন্তু আমার চেয়ে ফরসা অনেক। বড় বড় দুটি চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—থোলো থোলো হয়ে চাঁদপানা মুখের উপর এসে পড়েছে !

এই ছেলেটিকে দেখতে আমার বেশ লাগত। মনে হত ঠিক যেন গল্পের

banglabooks.in

রাজপুত্তুর ! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এ কোনও দিন কোনও অচিন দেশে চলে যাবে, সেখানে কত কাণ্ড করবে, তারপর সাতডিঙা ভরে ধন-দৌলত আর রাজকন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবত। বোধ হয় সেই অচিন দেশের কথা !

রেলিঙের ধারে রোজ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার সঙ্গে বোধ হয় তার ভাব করবার ইচ্ছে হত। এক একদিন সে তার সিংহাসন ছেড়ে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসত ! বোধ হয় সে আমাকে তার রাজ্যের পাত্তরের পুত্তুর, কী মিত্তরের পুত্তুর মনে করত—যাকে সঙ্গে নিয়ে সে কোনও দেশদেশান্তর চলে যাবে। আমি কিন্তু তাকে আসতে দেখেই ছুট দিতাম। তার সঙ্গে আলাপ করতে আমার কেমন ভয় হত—যদি সে আমায় নিয়ে আমার মা বাপকে কাঁদিয়ে কোনও অজগর বনে চলে যায় মৃগয়া করতে ! সে যদি আমাদের পুঁটুর মতো হত তাহলে তখনই আমি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলতাম। কিন্তু সে যে ছিল একেবারে অন্য রকম—রাজপুত্তুরের মতন ! আমি ছুটে পালাবার সময় দেখতাম, সে লোহার রেলিঙ ধরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন অত্যন্ত কাতর ভাবে। তার সেই চাহনি দেখে আমার কেমন মায়া করত। আমি যদি তার কেউ আপনার-জন হতাম, তাহলে তার ওই চোখের দুঃখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতাম। আহা, ওর কি কেউ বন্ধু নেই ?

ছেলেটা নিশ্চয় ছিল মায়াবী। নইলে রোজ পুঁটুদের বাড়ি যাবার সময় তাকে দূর থেকে একবার না দেখে থাকতে পারতাম না কেন ? রোজ ভেবেছি আর যাব না, কিন্তু যাবার সময় কেমন করে যে গিয়ে পড়তাম, নিজেই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু রেলিঙের এপাশ থেকে তাকে দেখতেই আমার আনন্দ ছিল, ওপাশে যাবার লোভ আমার কোনও দিনই হয়নি, বরং বিতৃষ্ণাই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। সেদিন চড়কের মেলা। চৌধুরিবাবুদের বাড়ির উত্তর কোণে চৌমাথায় মেলা বসেছে—নানা রকম খেলনা বিক্রি হচ্ছে। এক জায়গায় একটা লোক ফানুস বিক্রি করছিল। আমি সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কত রঙের ফানুস—লাল, নীল,

banglabooks.in

সবুজ, হলদে—একসঙ্গে তাড়া করা। পেটফুলো সেই ফানুসগুলো সরু সরু সুতোয় বাঁধা। সেই বাঁধনটুকু ছিঁড়ে নীল আকাশে উড়ে পালাবার জন্যে তারা ছটফট করছিল। কেবলই মাথা দোলাচ্ছি। আমি ভাবছিলাম এদের একটা যদি কোনও রকমে ছাড়া পায়, তাহলে দেখি কতদূর সে উড়ে যায়—কতদূর—কতদূর ! আমার হাতে যদি তখন কেউ একটা ফানুস দিত, আমি ঘরে না নিয়ে গিয়ে সেটাকে আকাশে ছেড়ে দিতাম। সে কেমন দুলতে দুলতে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কোথায় কোন স্বপ্নলোকে চলে যেত।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কে আমায় কোলে তুলে নিল। হাত দুটো তার খুব কড়া ঠেকল বটে, কিন্তু তুলে নেবার ধরনে জোর নেই ; যেন আদর আছে। সে আমাকে একেবারে সেই চৌধুরিবাবুদের কেয়ারি করা বাগানের মধ্যে এনে হাজির করল। আমার মন থেকে তখনও সেই রঙিন ফানুসের নেশা কাটেনি। আমার কেমন বোধ হতে লাগল ওই ফানুসগুলোই যেন আমাকে এখানে উড়িয়ে এনেছে !

একটা ফুল গাছের ঝোপ থেকে গুঁড়ি মেরে সেই ছেলেটি বেরিয়ে এল। বুঝি এতক্ষণ সে লুকিয়েছিল ! তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাত ধরে সে বলল—"তোমার নাম কী ভাই ?" কী মিষ্টি গলার সুর ! আমার সর্বাঙ্গের অস্বোয়াস্তি এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমি কোনও কথাই কইতে পারলাম না। সে আস্তে আস্তে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার সেই সোনালি সিংহাসনে আমায় বসাল। তারপর সে আমার পায়ের কাছটিতে মাটিতে গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আমি তন্ময় হয়ে তার সেই সুন্দর মুখখানি, টানা টানা চোখদুটি একদৃষ্টে দেখছিলাম, হঠাৎ সে বলে উঠল—"অমন করে কী দেখছ ? আমার সঙ্গে ভাব করবে না ?"

ভারি ইচ্ছা হতে লাগল—ছুটে গিয়ে এই মিষ্টি আদরের জবাব দিই, কিন্তু গলা কেমন আটকে গেল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, চোখের কোণে জল আসতে লাগল !

সে তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁট দুখানি একটু কাঁপিয়ে বলল— "রাগ করেছ ভাই, ধরে এনেছি বলে ? নইলে তুমি যে আসতে চাওনা ! কী করব ? তোমার সঙ্গে যে বড্ড ভাব করতে ইচ্ছে হল—তাই তো ধরে আনলাম।

banglabooks.in

রাগ করো তো আবার ছেড়ে দিই।" বলে আস্তে আস্তে তার সেই সুন্দর মুখখানি আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনল। ইচ্ছে হতে লাগল সেই মুখখানি দু হাতে ধরে বলি—না, না, রাগ করিনি, রাগ করিনি! কিন্তু পারলাম না।

সে হতাশ দৃষ্টিতে আমার নির্বাক মূর্তির দিকে খানিক চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে তার মুখখানি শুকিয়ে এল, চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল। একটি ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল—"আমার সঙ্গে ভাব করবে না? আমার বন্ধু হবে না? আচ্ছা বেশ, তোমায় ছেড়ে দিলাম।" বলে সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি আর থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে তার মুখখানি দু হাতে ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম। সে হেসে বলল—"তবে তুমি আমার বন্ধু হলে?" আমি ঘাড় নাড়লাম—"হ্যাঁ।"

সে মহা আনন্দে আমার হাত ধরে টানতে টানতে সমস্ত বাগানটা ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করাল। সেখানে একটা গাছের ডালে বাঁধা লাল, নীল, হলদে রঙের একতাড়া ফানুস—ঠিক তেমনিধারা, যেমন মেলার হাটে বিক্রি হচ্ছে দেখেছিলাম। সে সেই ফানুসগুলো নিয়ে এক একটি করে বাঁধন খুলে উড়িয়ে দিতে লাগল—একটুও মায়া করল না। মনের আনন্দে কী যে করবে, সে যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। ছাড়া পাওয়া ফানুসগুলো উড়ে উড়ে সন্ধ্যার ঝাপসা আকাশটাকে রঙে রঙে একেবারে রঙিন করে তুলল। সব ফানুসগুলো যখন ছাড়া শেষ হয়ে গেল, তখন সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"আমার নাম সুরজিৎ! আমাকে তুমি সুরো বলে ডেকো—বুঝলে?"

আমাদের দুজনকার খুব ভাব হয়ে গেল। এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই বাগানের মধ্যে আমাদের দুই বন্ধুর খেলার আসর, গল্পের আসর জমতে লাগল। সুরোর খেলনার অন্ত ছিল না। ঘুড়ি লাটাই, ফুটবল ব্যাটবল, লাট্টু, মারবেল—এসব তার অগুন্তি ছিল। মাঝে মাঝে সে নতুন নতুন রঙিন বাক্সোয় বন্ধ নানা রকম ছবিওয়ালা বিলিতি খেলা নিয়ে আসত। সেই সব খেলা সে আমায় শেখাত। আমরা দুজনে খেলতাম। এ ছাড়া সুরোর একটি সরু কাঠের বাঁশি ছিল। সে চমৎকার বাজাত এই কাঠের বাঁশিটি! আমার ভারি ভালো লাগত! আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম—"কোথা

banglabooks.in

থেকে শিখলি ভাই বাজাতে ?" সে বলত—"রানি মায়ের কাছে।"

রানি মা ছিলেন সুরোরই মা। সুরো শুধু মা না বলে কেন তাঁকে রানি মা বলত জানিনা। কিন্তু তার মুখে ওই রানি মা ভারি মিষ্টি শোনাত। মায়ের কত কথা সুরো আমার কাছে বলত। শুনতে আমার ভারি ভালো লাগত—ঠিক গল্পের মতন। এই গল্প শুনে শুনে মনে মনে রানি মায়ের একটা ছবি আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম। সেই ছবিটিকে ভালোবাসতে আমার ভারি ইচ্ছা করত। তাঁকে চোখে দেখিনি কিন্তু সুরোর বাঁশির সুরে মনে হত যেন তাঁরই মিষ্টি গলা শুনছি।

সুরোর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেলেও আমার মনে হত, সে যেন সামান্য ছেলে নয়—সে সত্যিকার রাজপুত্তুর। বিশেষ, সে যখন বাঁশি বাজাত আর রানি মায়ের গল্প বলত তখন কোনও দেশের কোনও রাজপুত্র সুরজিৎ আমার চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠত! আর ওই চৌতলা প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মনে হত যেন কোনও দূর দূরান্তরের রাজপুরী! আমি দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতাম সন্ধ্যাবেলায় বাজানো রাজপুত্র সুরজিতের এই বাঁশির সুর বাতাসে ভাসতে ভাসতে কোন রাজকুমারীর বুকে গিয়ে বাজছে কে জানে!

সুরো হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করত—

"অমন একমনে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবছিস ?"

আমি থতমত খেয়ে যেতাম। সুরো বাঁশি ফেলে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে তার গালে মুখে বুলিয়ে দিত।

হঠাৎ একদিন হাসি খেলা গান গল্প সব বন্ধ হয়ে গেল—সুরোর অসুখ হয়ে। আমি যেদিন সেই বাগানে গিয়ে সুরোকে প্রথম দেখতে পেলাম না, যখন দেখলাম সমস্ত বাগানখানা শূন্য, তখন অমার মনে হল রাজপুত্র আমায় যেন একা ফেলে কোনও দুর্গম দেশে চলে গিয়েছে। বাগানের বাতাস আর গাছের পাতা হা-হা করে কাঁদছে! একদিন গেল, দুদিন গেল, সপ্তাহ গেল, তবু সুরোর দেখা নেই। আমাদের খেলার আসর যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য রয়ে গেল। ইচ্ছে হত—ভারি ইচ্ছে হত—ওই চৌতলা বাড়িটার মধ্যে গিয়ে সুরোকে একবার দেখে আসি— একটিবার মাত্র, কিন্তু কী করে যাব

banglabooks.in

ঠিক করতে পারতাম না। সুরোর সঙ্গে দেখা হত না, কিন্তু মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমের মাঝে এসে সে যেন আমায় বাঁশি শুনিয়ে যেত। আমি বাঁশির শব্দে জেগে উঠতাম, কিন্তু জেগে সে বাঁশি আর শুনতে পেতাম না। আশায় আশায় কতক্ষণ জেগে থাকতাম, কিন্তু হায় সে বাঁশি আর বাজত না!

শুনলাম তার জ্বর বিকার হয়েছে। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। কাকার ছোট ছেলে খুদুর জ্বর বিকার হয়েছিল। তার সেই অসুখে ছটফটানি, ধমকানি, আবোলতাবোল গোঙানি—সব আমার দেখা ছিল। সুরোর সেই একই অসুখ হয়েছে শুনে আমার সমস্ত বুকটা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। খুদু পনেরো দিনের দিন মারা যায়। সুরোর যদি তাই হয়? না, না! এ কথা মনে আনতেই কান্না আসে! কিন্তু মন থেকে ওই পনেরো দিনের আতঙ্কটা কিছুতেই দূর করতে পারতাম না। মনে মনে ঠাকুরকে বলতাম—হে ঠাকুর, ওই পনেরোর দিনটা যেন না আসে!

চৌধুরিবাড়ির সকাল সন্ধ্যায় নহবত বন্ধ হয়ে গেল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে ঘড়ি বাজত তাও আর শোনা যেত না, সেপাইদের ঘরে রাত্রে মাদলেও আর কাঠি পড়ত না। পাড়ার লোকেরাসুদ্ধ যেন পা টিপে টিপে চলত—পাছে শব্দ হয়, পাছে খোকাবাবু চমকে ওঠে—পাছে তার অসুখ বাড়ে!

আমি স্কুল যাবার সময় সুরোদের বাড়ির দিকে চেয়ে ভাবতাম—সে কোনখানে কোন ঘরটিতে শুয়ে আছে তার রানি মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। ভাবতে ভাবতে মনে হত যেন কেমনতর একটা ঝাপসা কালো ছায়া সেই বাড়ির গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে! দেখে আমার ভয় করত। তারপর বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় আমি আমাদের সেই খেলার বাগানের সামনে চুপিচুপি এসে দাঁড়াতাম। দেখতাম ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা ভিখারির দল চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যাচ্ছে। দেখে আমার কান্না পেত। এই সব ভিখারিদের রোজ সন্ধ্যাবেলা সুরো ভিক্ষা দিত। সে বলত, তার রানি মা এই ভিক্ষা দেওয়ার খেলা তাকে শিখিয়েছেন। এই খেলাতে দেখতাম সুরোর সবচেয়ে যেন বেশি আনন্দ। এই ভিখারির দল এলে সে সব খেলা ফেলে, সব কিছু ভুলে এদের কাছে ছুটে যেত। তার সেই সুন্দর হাতখানি নেড়ে নেড়ে সে কাউকে চাল, কাউকে পয়সা, কাউকে ফল বিতরণ করত। আবার কখনও

banglabooks.in

কখনও কোনও গরিব মেয়েকে বাগান থেকে বেছে একটি ফুল তুলে দিত। যে যা পেত, খুশি হয়ে হাসিমুখে চলে যেত। এখন আর সুরোর সেই ভিক্ষা দেওয়া খেলা নেই ; এদের মুখে সে হাসিও নেই। তাদের সেই শুকনো মুখ দেখে আমারও বুকটা শুকিয়ে আসত।

দেখতে দেখতে সেই সর্বনেশে পনরো দিনটা এগিয়ে এল। সেদিন সকালে উঠেই শুনলাম—সুরোর আজ খুব বাড়াবাড়ি, আজকের দিনটা কাটে কি না ! পনেরো দিনের দিন খুদু যখন মারা যায়, তখনও ঠিক এই কথাই শুনেছিলাম। সেই কথা মনে পড়ে বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কেবলই মনে হতে লাগল সুরোকে যদি আজ একটিবার দেখতে পাই, তাহলে তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।

সারাদিন সুরোর জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। তাদের বাড়ির আশে-পাশে দিনের মধ্যে কতবার ঘুরে এলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল কে যেন বলবে সুরো ভালো আছে, কোনও ভয় নেই। ওদের বাড়িতে কত লোক এল, কত লোক গেল, কিন্তু কেউ সে কথা বলল না। সবাই যেন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

খুদু যেদিন মারা যায় ঠিক এমনিধারাই হয়েছিল।

রাত্রে যখন বুড়ি ঝি বিছানা পেতে দিতে এল, আমার তখন কেমন কান্না পাচ্ছিল। আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলাম—"বুড়ি, সুরো কি সত্যি বাঁচবে না ?"

বুড়ি বলল—"সবাই তো তাই বলছে ভাই !"

আমি বললাম—"ওরা তো রাজা, ওরাও কি ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারে না ?"

বুড়ি বলল—"ভাই, যম কি আর রাজা প্রজা মানে ?"

সুরো তা হলে বাঁচবে না ? আমি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি তো কই কাঁদিনি, তবু বুড়ি বলল—"কেঁদো না ভাই ঘুমোও।" মনে হল বুড়ি যেন তার ডান হাত দিয়ে তার চোখ দুটো একবার মুছে নিল ! রোজ রাত্রে শোবার সময় এই বুড়ির সঙ্গে আমি সুরোর কত গল্পই করতাম। আজ আর কোনও গল্প করতে ইচ্ছে

banglabooks.in

হল না।

বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—"ঘুমুলি ভাই?"

আমি বললাম—"না। আমার আজ আর ঘুম আসছে না; তুই যা।"

বুড়ি বলল—"দেখ, চৌধুরিবাবুদের খোকাকে বাঁচাবার এক উপায় আছে—কিন্তু সে কি ওরা পারবে?"

আমি বিছানায় উঠে বসে বললাম—"কী উপায়, বুড়ি?"

সে বলল—"তাহলে আমাদের দেশের একটা গল্প বলি শোন।"

আমি চুপ করে রইলাম। বুড়ি গল্প বলতে লাগল।

"সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন খুব ছোট—তোর চেয়েও বোধ হয় বয়স কম। আমি তখন দেশে আমার বাপের বাড়িতে থাকতাম। আমাদের দেশের রাজার সবেধন একমাত্র ছেলে! অনেক মানত, অনেক পুজো-স্বস্ত্যয়ন করে এই ছেলে হয়। এই ছেলের ভাতে রাজবাড়িতে মহা ধুম লেগে গেল। তেমন ধুম আমাদের দেশে কেউ কখনও দেখেনি! যাত্রা পাঁচালি তরজা, কত রকমের আমোদ যে হয়েছিল, তার ঠিক নেই। সাতদিন, সাতরাত্রি গাঁয়ের কেউ ঘুমোয়নি। দিন-রাত হইহই রইরই ব্যাপার! চারদিক থেকে এত লোক এসেছিল যে গাঁয়ে আর লোক ধরে না—বোধ হত যেন মস্ত মেলা বসে গেছে। তার উপর রাজা দেশবিদেশ থেকে যত বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ফকির নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাবার জন্যে। তাঁদের দেখবার জন্যেই বা ভিড় কত! এই সাধু সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন তলায়, কেউ চণ্ডীতলায় আসন পেতে বসলেন। সালুমোড়া রাজবাড়ির পালকি, সামনে সেপাই-বরকন্দাজ এবং ভিতরে রাজপুত্তুরকে নিয়ে বটতলা থেকে পঞ্চানন তলা, পঞ্চানন তলা থেকে চণ্ডীতলায় সকাল সন্ধ্যা সাধু সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ কুড়িয়ে ফিরতে লাগল। সন্ন্যাসীরা কেউ পায়ের ধুলো দিয়ে, কেউ যজ্ঞের ভস্ম দিয়ে, কেউবা একটি রাঙা রুদ্রাক্ষ দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। কত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কত বাউল-ফকির যে কত রক্ষা কবচ এবং হরেক রকমের মাদুলি দিলেন তার ঠিক নেই! মাদুলির ভারে সেই আট মাসের ছেলের গলা ও ঘাড় ঝুঁকে পড়ল, হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল! বেচারা হাত তুলে, ঘাড় নেড়ে যে একটু

banglabooks.in

খেলা করবে তার উপায় রইল না। সবাই বলল, হ্যাঁ, এ ছেলে নিরোগ তো হবেই, চাই কী অমরও হতে পারে!

"কিন্তু অদৃষ্ট যাবে কোথা? আট দিন যেতে না যেতেই ছেলে অসুখে পড়ল। সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক চরণামৃত দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না—অসুখ বেড়েই চলল। এত আমোদ আহ্লাদ দুদিনের মধ্যেই কর্পূরের মতো উবে গেল। অমন জমজমাট গাঁ হানাবাড়ির মতো হাঁ-হাঁ করতে লাগল। রাজাবাবু কেবল সন্ন্যাসীদের ছাড়লেন না। তিনি হুকুম দিলেন ছেলেকে না সারিয়ে কোনও সাধু সন্ন্যাসী গাঁ ছেড়ে যেতে পাবেন না। গেলে টের পাবেন! সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন তলায় বসে নানা রকম ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করে দিলেন। রোজ রোজ নতুন নতুন মাদুলি কবচ তৈরি হতে লাগল। শেষে রাজাবাবু বলে পাঠালেন যে ছেলের গায়ে মাদুলি বাঁধবার আর জায়গা নেই। উপায় কী?

"এত করেও কিছুতে কিছু হল না। ছেলে এখন যায়, তখন যায় হয়ে উঠল। রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাড়ির চাকর দাসি সবাই চুপিচুপি বলাবলি করতে লাগল, ছেলে বাঁচবে না! তখন ছেলের এক মামা কোনও শহর থেকে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির করল। ডাক্তার এসেই আগে তাড়াতাড়ি ছেলের বুক থেকে নিজের হাতে মাদুলি কবচ সব খুলে ফেলে দিল। কারও কথা শুনল না। বলল—মাদুলির ভারে যে ছেলে নিশ্বাস নিতে পারছে না, দম আটকে আসছে! ডাক্তার আসতেই গাঁয়ে আবার হইচই পড়ে গেল। লোকজন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল—এটা আন, ওটা আন, সেটা আন! গাঁ থেকে শহর পর্যন্ত ঘোড়ার ডাক বসে গেল। সেপাই বরকন্দাজ কেউ ডাক্তারের লেখা কাগজ হাতে ওষুধ আনতে ছুটল, কেউ বরফ আনতে ছুটল, কেউ আরও কত কী আনতে ছুটল। এই গোলমালের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীদের দিকে আর কারও নজর রইল না; তাঁরা সেই ফাঁকে যার যেখানে সরে পড়লেন। বটতলা, পঞ্চাননতলা ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল চণ্ডীতলা থেকে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নড়লেন না; তিনি অটল হয়ে বসে রইলেন।

"আমার মা ছিলেন এই রাজপুত্রের দাসী। এই ছেলের ভাতে তিনি পরনে

banglabooks.in

পেয়েছিলেন গরদের শাড়ি, হাতে পেয়েছিলেন সোনার অনন্ত। আর 'আমি পেয়েছিলাম একখানি লাল চেলি, আর আমার ছোট ভাইটি পেয়েছিল একটি রুপোর ঝুমঝুমি।

"আমার ছোট ভাই তখন বোধ হয় বছরখানেকের হবে। মা রাজবাড়ি থেকে একবার সকালে, একবার দুপুরে, একবার সন্ধ্যাবেলা এসে তাকে দুধ খাইয়ে যেত ! সারাদিন সে আমার কাছে থাকত। সে কাঁদলে আমি তাকে কোলে বসিয়ে দোল দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম ! রাত্রে সে আমার বুকটিতে হাত রেখে আমার পাশে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকত। আমার ভাইটি ছিল ভারি লক্ষ্মী, আমাকে একটুও জ্বালাতন করত না ! তার সেই কচি কচি নরম হাত দিয়ে আমায় সে জড়িয়ে ধরত আমার এখনও তা মনে লেগে আছে।

"ডাক্তার আসতে দিন দুয়েক রাজপুত্রের অসুখ একটু কম পড়ল। মা আমার ভাইটিকে দুধ খাওয়াতে এলে তাঁর মুখেই শুনতাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই অসুখ আবার বেড়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যাবেলা মা এসে আমাকে চুপিচুপি বললেন—'আজ রাতটা বোধ হয় কাটবে না !' বলে মা আমার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমার ভাইটিকে একটু আদরও করলেন না, একটু দুধও খাওয়ালেন না। দেখে, মায়ের ওপর আমার ভারি রাগ হল। আমি ঝিনুকে করে একটু গাই-দুধ আমার ভাইটিকে খাইয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে খেতে চাইল না ; আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে আজ আর আমার বুকে হাতটি রেখে ঘুমোল না। আমার মনে কেমন অস্বোয়াস্তি হতে লাগল। আমার ভালো ঘুম হল না। আমি রাত্রে উঠে উঠে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলাম। সে অঘোরে ঘুমতে লাগল।

"পরদিন মা রাজবাড়ি থেকে একবারও এলেন না—ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। আমার ভাইটিও এমন লক্ষ্মী যে সারাদিন কাঁদল না, চুপটি করে পড়ে রইল। আমি তাকে দুধ খাওয়াতে গেলাম, সে দুধ গিলতে পারল না ! আহা বেচারার দোষ কী ? আমি ছেলেমানুষ কি দুধ খাওয়াতে জানি ? বেচারা সারাদিন না খেয়ে পড়ে রইল, কিন্তু এমনই লক্ষ্মী যে তবু একটু কাঁদল না। আহা, ভাইটি আমার ! মায়ের উপর ভারি রাগ হতে লাগল।

banglabooks.in

এমন লক্ষ্মী ছেলেকে হেনস্থা করে !

"সারা রাত্রির মধ্যেও মা এল না। আমি একলাটি ভাইকে নিয়ে পড়ে রইলাম। পরের দিন সকালে এসে মা বললেন—'বোধ হয় মা-চণ্ডী মুখ তুলে চাইলেন। রাজকুমার আজ সাত দিন পরে চোখ মেলে চেয়েছে। কাল দিন রাত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটেছে, ভগবানই জানেন।' বলে মা আমার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

"আমার ভাইটি তখনও ঘুমচ্ছিল। আমার মা গিয়ে তাকে আদর করে ডাকলেন—'খোকন ! খোকন ! খোকন আমার।' খোকন কোনও সাড়া দিল না। আর সেই রূপোর ঝুমঝুমিটা ধরে মা তার কানের কাছে কত বাজালেন, কিন্তু ভাই আমার আর জাগল না," বলে বুড়ি চুপ করল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বললাম—"কী হল বুড়ি ? তোমার ভাইয়ের কী হল ?"

সে বলল—"কী হল ভাই, তাতো বুঝতে পারলাম না। সে আর ঘুম থেকে জাগল না। অনেকে অনেক কথা বলল। কেউ কেউ বলল, ওই যে চণ্ডীতলায় সন্ন্যাসী অচল অটল হয়ে বসেছিল, সেই নিশির ডাক দিয়ে আমার ভাইয়ের প্রাণটিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।"

আমার পাশ থেকে আমার ছোট ভাই নুটু বলে উঠল—"নিশির ডাক কী বুড়ি ?" সে বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে বুড়ির গল্প শুনছিল।

বুড়ি বলল—"নিশির ডাক ? সে ভাই বড় সর্বনেশে কাণ্ড। তার কথা ভাবতেও বুকে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

নুটু বলল—"নিশির ডাকে কী হয় বুড়ি ?"

বুড়ি বলল—"জ্যান্ত মানুষের প্রাণপুরুষ মরা মানুষের দেহে চলে যায় আর অমনি দেখতে দেখতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, আর জ্যান্ত মানুষ ধড়ফড়িয়ে মারা যায়।"

নুটু বলল—"তাই বুঝি তোমার ছোট ভাই মারা গেল, আর তোমাদের রাজকুমার বেঁচে উঠল ?"

বুড়ি বলল—"আমাদের গাঁয়ের লোকেরা তো তাই বলে ভাই ! তাদের কেউ-কেউ নাকি দেখেছিল জটা জুটধারী ত্রিশূল হাতে এক খ্যাপা ভৈরব

banglabooks.in

banglabooks.in

সেই রাত্রের অন্ধকারে একটা ডাব হাতে করে আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

নুটু বলল—"ডাব হাতে করে কেন?"

বুড়ি বলল—"ওই ডাবের মধ্যে করেই তো প্রাণপুরুষকে নিয়ে যায়। ওই ডাবই হচ্ছে মন্ত্রপড়া ডাব। কালভৈরবের পুজো দিয়ে, সাত দিন, সাত রাত্রি, অনাহারে, অনিদ্রায় অনবরত এক মনে মারণ মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ ভৈরবরা ওই ডাবকে গুণ করে। ওই ডাব তখন আর ডাব থাকে না—ওর মধ্যে তখন কালপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই কালপুরুষ এসে তাঁর হাতের মৃত্যুদণ্ডটি মানুষের বুকে ছুঁইয়ে বুকের ভেতর থেকে প্রাণটিকে খসিয়ে নিয়ে চলে যান।"

নুটু বলল—"যার প্রাণটাকে নিয়ে যায়, সে কিচ্ছু করতে পারে না?"

বুড়ি বলল—"তার সাধ্য কী কিছু করে! তার প্রাণ সুড়সুড় করে কালভৈরবের সঙ্গে চলে যায়।"

নুটু বলল—"ওর কোনও উলটো মন্ত্র নেই? যে মন্ত্র জপ করলে কালভৈরব আর কাছে ঘেঁসতে পারে না?"

বুড়ি বলল—"না, কোনও উলটো মন্ত্র নেই বটে; কিন্তু নিশির ডাকে যদি সাড়া না দাও, তাহলে কালভৈরবের ঠাকুরদাদাও তোমার কিছু করতে পারবে না।"

নুটু বলল—'নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া কাকে বলে?"

বুড়ি বলল—"তা বুঝি জান না? ওই মন্ত্রপড়া ডাব নিয়ে ভৈরবরা নিশুত রাতে, যখন চারদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, কেউ কোথাও জেগে নেই, সেই সময় কালো ত্রিশূল হাতে, কালো কাপড় পরে, বাড়ির দরজায়-দরজায়, বাড়ির জানলার কাছে কাছে—যেখানে ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমোয়, সেইখানে ঘুরে বেড়ায়, আর আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় ছেলেদের নাম ধরে ডাকে। যে ছেলে ঘুমের ঘোরে সাড়া দেয়, কালপুরুষ এসে তার প্রাণটিকে বুক থেকে খসিয়ে নেয়—"

নুটু বলল—"যে সাড়া দেয় না?"

বুড়ি বলল—"তার কিছুই হয় না। সে যেমন ছিল, তেমনই থাকে।"

banglabooks.in

"আর যে সাড়া দেয় ?"

"তার প্রাণপুরুষটি তার ওই সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে বেরিয়ে আসে। তার পর চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনই ওই মন্ত্রপড়া ডাব প্রাণপুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে। প্রাণপুরুষ ডাবের কাছাকাছি এলেই ভৈরব ঠাকুর ওই ডাবের মুখটি একবার খুলে ধরেই চট করে বন্ধ করে দেন, আর প্রাণপুরুষ ওই ডাবের মধ্যে আটকা পড়ে যায়।"

"তারপর ?"

"তারপর ওই ডাবের মুখটি একটুখানি ফাঁক করে প্রাণসুদ্ধ ডাবের জল মরা মানুষকে খাইয়ে দেয়—মরা মানুষ সেই নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে।"

নুটু বলল—"প্রাণপুরুষ সেখান থেকে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে এসে নিজের দেহে ঢুকে পড়ে না কেন ?"

"তা কি আর পারে ভাই ? সে তখন বত্রিশ নাড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে—তার কী আর পালাবার যো আছে ! সে তখন পালাতেও পারে না—থাকতেও তার ভালো লাগে না।"

"থাকতে ভালো লাগে না কেন ?"

"নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে থাকতে কি মানুষের ভালো লাগে ? সে তবু বাড়ি ; এ যে নিজের দেহ ছেড়ে পরের দেহে বাস করতে হয় ! এ কী কম কষ্ট ? নিজের মা বাপ থাকতে পরের মাকে মা বলতে হয়, পরের বাপকে বাপ বলতে হয়। নিজের ভাই বোন কেউই আর তখন আপনার থাকে না।"

"সব পর হয়ে যায় ?"

"সব পর হয়ে যায় !"

"তোমার সেই ছোট ভাইটি পর হয়ে গেলে, সে তোমায় চিনতে পারত ?"

"পারত বই কী ! সেই রাজকুমারের বড় বড় চোখের ভেতর থেকে আমায় উঁকি মেরে দেখে, সে আমায় খুব চিনতে পারত—এ আমি বেশ টের পেতাম। আমার মনে হত সে যেন মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বলত—দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও।"

নুটু বলে উঠল—"তুমি তাকে কোলে নিয়ে ছুট্টে পালিয়ে যেতে না

banglabooks.in

কেন ?”

“কী করে যাব ভাই ? সে কী তখন আমার ছোট ভাইটি আছে—সে যে তখন রাজপুত্তুর—পরের ছেলে !”

“তোমার ভাই তাতে কাঁদত ?”

“কাঁদত বই কী ! আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ত !”

“তুমি তাকে খুব আদর করতে না কেন ?”

“আদর করতাম তো। কিন্তু সে আদর তো আমার ভাই পেত না—সে পেত আমাদের গাঁয়ের রাজাবাবুর ছেলে। যে গায়ে আমি হাত বুলতাম সে গা তো আমার ভাইয়ের গা নয়, সে যে রাজকুমারের গা। তাতে আমার ভাইয়ের প্রাণ খুশি হবে কেন ? সে তাতে আরও কাঁদত। রাজার বাড়ির এত আদর যত্নেও আমার ভায়ের প্রাণে কোনও সুখ ছিল না—এ আমি তার সেই মুখখানি দেখেই বুঝতে পারতাম। আহা, তার চেয়ে আর ভাইটি আমাদের গরিবের ঘরে নুন-ভাত খেয়ে অনেক সুখে থাকত।”

নুটু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—“এ তোমার গল্প, না ? এসব কথা সত্যি না ; না বুড়ি ?”

বুড়ি বলল—“না ভাই, এ সব সত্যি। একটুও মিথ্যে নয়।” নুটু বলল—“এ গল্প ভালো নয়, একটা ভালো গল্প বলো বুড়ি।”

বুড়ি বলল—“না, আজ আর গল্প নয়, তোরা ঘুমো, রাত হল।” বলে বুড়ি বাসন মাজতে চলে গেল। আমি বুড়ির গল্পের কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

নুটু দেখি আমার কাছে অনেকখানি সরে এসে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। আমি বললাম—“কী রে নুটু ?”

নুটু বলল—“দাদা,বড় ভয় করছে !”

আমি বললাম—কীসের ভয় ?”

“যদি নিশিতে ডাকে ?”

আমি বললাম—“সাড়া দেব না।”

“যদি দিয়ে ফেলি ?”

banglabooks.in

"তা হলে ভারি মুস্কিল হবে কিন্তু !"

নুটু ভয় পেয়ে বলে উঠল—"তবে কী করব দাদা ? কী হবে !" বলে সে কেঁদে ফেলে।

আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম—"তোর কোনও ভয় নেই, আমি তোকে পাহারা দেব।"

নুটু চোখ মুছতে মুছতে বলল—"কিন্তু দাদা, তুমি যেন অন্যমনস্কে সাড়া দিয়ে ফেলো না।"

আমি বললাম—"না রে না, কোনও ভয় নেই ! এখানে—এই শহরে নিশির ডাক কোথা থেকে আসবে ?"

নুটু বলল—"যদি আসে ! তুমি দাদা, জানলাগুলো বন্ধ করে দাও।"

আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলাম। নুটু আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম আসছিল না, আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—সুরোর কথা।

রাত কত জানি না, বুড়ি হঠাৎ আবার ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—"কী রে তোরা ঘুমুলি ?"

আমি বললাম—"কেন বুড়ি ?"

সে খুব চাপা গলায় বলল—"ভাই, তোরা আজ খুব সাবধানে থাকিস !"

আমি বললাম—"কেন, কী হয়েছে ?"

সে বলল—"বড় সর্বনেশে কথা শুনে এলাম। চৌধুরিবাবুদের খোকাকে ডাক্তার-বদ্যি এলে দিয়েছে—বিষ বড়ি খাইয়েও কিছু হল না।"

আমি বলে উঠলাম—"বুড়ি, কী হবে ? আমি সুরোকে দেখতে পাব না ? কত দিন তাকে দেখিনি !"

বুড়ি আঁতকে উঠে বলে উঠল—"না, না ! এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে করিসনি—সর্বনাশ হবে !"

আমি বললাম—"কেন বুড়ি ?"

বুড়ি বলল—"সে তুই ছেলেমানুষ বুঝতে পারবি না ! তুই ভাই, আজ চুপ করে থাক। সুরোর কথা আজ আর মনে তোলাপাড়া করিসনি।"

আমি বললাম—"তুই অমন করছিস কেন বুড়ি, কী হয়েছে ?"

banglabooks.in

বুড়ি বলল—"ভাই, কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। আমার ছোট ভাইটি যে-রাতে মারা যায় সে রাতেও আমার বুক এমনি ধড়ফড় করেছিল। তখন কিছু বুঝতাম না, তাই ওই সর্বনাশটা হয়ে গেল ! আজ তোরা কারও ডাকে সাড়া দিসনি—বুঝলি—কারও ডাকে নয়।"

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ করে উঠল ! আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—"তবে কি আজ নিশির ডাক হবে ?"

বুড়ি বলল—"সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। দেখ না আজকের রাতটা কী রকম ভয়ানক অন্ধকার হয়ে উঠেছে—কেবলই গা ছমছম করছে ! গাছপালাগুলো অবধি ভয়ে কাঠ হয়ে আছে ! বাড়িগুলো যেন থরথর করে কাঁপছে ! আকাশের বুকের ভেতরটা যেন দুরদুর করছে। আর বাতাসের গায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা কালপ্যাঁচা কেবলই ডানা দিয়ে ঝাপটা মারছে—ঝপ-ঝপ-ঝপ !"

আমি বললাম—"কিন্তু ভৈরব ঠাকুর কী এসেছে ?"

বুড়ি বলল—"এসেছে বই কী ! শুনলাম, চৌধুরিবাবুরা কোথা থেকে এক ভীম-ভৈরবকে আনিয়েছে। আমি ছাদে উঠে দেখলাম, ওদের ওই ঠাকুরবাড়ির দিক থেকে কালো কুণ্ডলী ধোঁয়া উঠছে—বোধ হয় কালভৈরবের পুজো হচ্ছে।"

আমি বললাম—"কিন্তু বুড়ি, নুটু যে ঘুমিয়ে রইল। ও তো কিছু জানল না।"

বুড়ি বলল—"ওকে জাগিয়ে দে ভাই, জাগিয়ে দে।"

আমি নুটুকে ধরে ঠেলে দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে ঢুলতে লাগল। আমি তাকে ঠেলা দিতে দিতে বললাম—"নুটু আজ নিশির ডাক হবে—চুপ করে বসে থাক।"

নুটু ঘুমের ঘোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফ্যালফ্যাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল—কোনও কথা বলল না। আমি বললাম—"বুড়ি, তুই আজ আর এখান থেকে নড়িসনি।" বুড়ি বলল—"তা আর বলতে ! আমি এই সারারাত জেগে রইলাম।" বলে সে আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর বলল—"দেখ, আজ আর দু চোখের পাতা এক করিসনি, তাহলেই

banglabooks.in

banglabooks.in

ওরা নিদুলি-মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।" আমি নুটুকে ধরে বসে রইলাম। পাছে ওরা নিদুলি-মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় এই ভয়ে কিছুতেই চোখ বুজলাম না! নুটু কিন্তু আমার গায়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরে দেখি বুড়িরও নাক ডাকছে। আমি ডাকলাম—"বুড়ি! বুড়ি!" সে সাড়া দিল না। নুটুকে ডাকলাম—"নুটু! নুটু!" সেও সাড়া দিল না। নিশ্চয় ওরা নিদুলি মন্ত্রে এদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে!—এই কথা ভাবছি, এমন সময় কে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে ঘরে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল। সব অন্ধকার! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—"বুড়ি! বুড়ি! নুটু! নুটু!" জবাব পেলাম না! সব একেবারে চুপ। আমি একা সেই থমথমে অন্ধকারে অসাড় হয়ে বসে রইলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে অন্ধকারগুলো ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার আশে পাশে, চারদিকে কালো কালো বিকট চেহারার নানা রকম মূর্তি তৈরি করে দেখাতে লাগল। আমি কাঠ হয়ে একদৃষ্টে সেই সব দেখতে লাগলাম। চোখ বুজতে পারলাম না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু নিদুলি মন্ত্রে আমার চোখের পাতা ক্রমেই ভারি হয়ে আসতে লাগল। শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথার তেভরটায় কে যেন আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। হাত, পা, কোমরের খিলগুলো হঠাৎ যেন ফুস করে খুলে গিয়ে আমার সর্বশরীর এলিয়ে গেল। তারপর কী হল জানি না।

"নিপু! নিপু!"

আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বললাম—"কী ভাই, কী ভাই সুরো?"

"নিপু! নিপু!"

"এই যে ভাই সুরো!—এই যে ভাই আমি!"

"নিপু! নিপু!"

"যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি!"

বলতে না বলতেই কে যেন আমাকে কোথা দিয়ে কেমন করে একেবারে চৌধুরিবাবুদের বাড়িতে সুরোর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল। আমার যেন হঠাৎ টনক নড়ল—তাইতো এ কী করেছি! ঘুমের ঘোরে নিশির ডাকে সাড়া

banglabooks.in

দিয়েছি। সর্বনাশ ! আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। কে এসে আমার হাত ধরল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—"না গো না, আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না। আমায় বাড়ি রেখে এসো !" কিন্তু সে আমার কথা কানে তুলল না। আমি আরও কাঁদতে লাগলাম। কে একজন নরম গলায় বলল—"ভয় কী তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।" বলে সে আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

আমি কেঁদে বললাম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমরা বাড়িতে রেখে এসো। নইলে আমার মা বড় কাঁদবে।" সে কী বলতে যাচ্ছিল, একজন খুব মোটা গলায় বলে উঠল —"বোধ হয় ছেলেটা টের পেয়েছে। তাই গোল বাধিয়েছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয় ! দাঁড়াও ওকে ঠাণ্ডা করছি।" —বলেই সে লোকটা এসে তার লোহার মতন শক্ত হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো সজোরে চেপে ধরল। অমনি আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল ; সর্বাঙ্গ শিরশির করতে লাগল। বুকের ভেতরটা ধুকধুক করতে করতে হঠাৎ ধপ করে একেবারে থেমে গেল। তারপর কী হল জানি না।

"নিপু এসেছিস ভাই ? নিপু !"

হঠাৎ দেখি সুরো ও আমি একটা যেন হাত-পাওয়ালা খুব ছোট্ট খুপরির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি করে রয়েছি। এই জায়গাটুকুর মধ্যে যেন কেবল সুরোকেই ধরে আমি যেন বেশি। তাই আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল—খুব একটা আঁট জামা গায়ে জোর করে পরিয়ে দিলে যেমন অস্বোয়াস্তি হয়, আমার তেমনই বোধ হচ্ছিল ! মনে হচ্ছিল যে জামাটা যদি ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যায়, যেন একটু আরাম পাই। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ওই হাত-পাওয়ালা ছোট্ট খুপরিটা সুরোর দেহ ; আমি তারই মধ্যে এসে প্রবেশ করেছি।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—"এরা জোর করে—ভুলিয়ে আমায় ধরে এনেছে, তুমি আমায় এখনই বাড়ি পাঠিয়ে দাও।" সুরো বলল—"রাগ করছিস কেন ভাই ? এরা এনেছে বলেই তো তোর সঙ্গে দেখা হল—নইলে

banglabooks.in

তো আর দেখা হত না।

"আমি যে চলে যাচ্ছি।"

"অ্যাঁ, চলে যাচ্ছিস? কোথা যাচ্ছিস, ভাই?"

"রাজকুমারীর কাছে।"

"কোন রাজকুমারী?"

"সেই যে রাজকুমারী, যে আমার জন্যে বসে বসে মালা গাঁথে।"

আমি বললাম—"সে তো গল্পের রাজকুমারী।"

সুরো বলল—"আমিও যে গল্পের রাজপুত্র। সেই গল্পের রাজকুমারীর সঙ্গে এই গল্পের রাজপুত্রের মিলন হবে। তবে তো গল্প শেষ হবে।"

আমি বললাম—"তুই গেলে কিন্তু রানি মা বড় কাঁদবেন।"

সে বলল—"তোরা তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস। বলিস—সুরো মৃগয়া করতে গেছে—এই এল বলে, তুমি কেঁদো না।"

আমি বললাম—"সুরো, তুই এমন নিষ্ঠুর হলি কী করে? আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

সুরো বলল—"দেখ দিকিন আমার বুকে হাত দিয়ে।"

সুরোর বুকে হাত দিয়ে দেখলাম তার প্রাণটি যেন তার বুকখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে আছে। আমি বললাম—"ভাই সুরো, তবু কেন যাচ্ছিস!" সুরো বলল—"তুই যে রাজকুমারীর বাঁশি শুনিসনি, তাই বুঝতে পারছিস না! সে ডাক শুনলে কী আর থাকা যায়! নইলে দেখিস না, এই মানুষ ঘরে আছে, হঠাৎ কাঁদিয়ে কেঁদে সে কোথায় বিবাগী হয়ে যায়।"

আমি বললাম—"সুরো, তোর জন্যে আমার বড় মন কেমন করবে, আমার কান্না পাবে।"

সুরো বলল—"আমার খেলনাগুলো তোকে দিয়ে গেলাম। তুই সেগুলো নিয়ে খেলিস, মনে হবে যেন আমার সঙ্গেই খেলছিস। এই দেখনা, আমি অসুখে শুয়ে-শুয়ে তোর দেওয়া সেই ছবির বইখানা দেখতাম আর আমার মনে হত, তুই যেন গল্প বলছিস।" আমি বললাম—"কিন্তু তোকে দেখতে না পেলে রানি মা বড় কাঁদবেন!"

সুরো বলল—"তুই তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস ভাই!"

banglabooks.in

আমি বললাম—"আমি কী করে ভুলিয়ে রাখব ?"

সে বলল—"তুই আমার মায়ের কাছটিতে থাকিস। বলিস— এই যে মা আমি তোমার সুরো ! সন্ধ্যাবেলা ফুলের বাগান থেকে খেলা শেষ করে এসে বলিস—এই যে মা, আমি তোমার সুরো— খেলা করে ফিরে এলাম। আমার বাঁশি শুনিয়ে তাঁকে বলিস—এই দেখ মা, তোমার সুরো কেমন বাঁশি বাজায়। আমার মুক্তোর মালাটা গলায় দিয়ে বলিস—এই দেখো মা, মুক্তোর মালা তোমার সুরোর গলায় কেমন মানিয়েছে ! মা মনে করবে, এই তো আমার সুরো ! সুরো তো কোথাও যায়নি !" আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—"না, না, আমি রানি মায়ের ছেলে হতে পারব না। আমার মায়ের জন্যে বড় মন কেমন করবে—আমার মা কাঁদবে, নুটু কাঁদবে !"

সুরো বলল—"কিন্তু এরা যে আমার বদলে তোকে রানি মায়ের ছেলে হবার জন্যেই নিশির ডাকে ভুলিয়ে এখানে এনেছে।" আমি কেঁদে উঠে বললাম—"না, না, আমি কিছুতেই তুই হব না, আমি নিপুই থাকব ! তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দে !"

সুরো বলল—"আচ্ছা, তোর ভয় নেই।"

আমি বললাম—"না, তুই ঠিক করে বল—আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিবি ?"

সুরো বলল—"দেব, দেব—আমি কথা দিচ্ছি তোকে ঠিক তোর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

আমি বললাম—"তবে এখুনি পাঠিয়ে দে।"

সে বলল—"দিচ্ছি। কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জানিস ?"

আমি বললাম—"কী ?"

সে বলল—"সেখানে গিয়ে তোদের জন্যে যদি বড্ড মন কেমন করে ?"

আমি বললাম—"তা কি করবে ? ওই মায়াবী মালা গলায় পরলে আমাদের কথা হয় তো আর মনেই থাকবে না।"

সুরো বলল—"হয়তো সন্ধ্যাবেলা তোর কথা মনে পড়বে, হয়তো রাত্রে শোবার সময় রানি মাকে মনটা খুঁজতে থাকবে, হয়তো সকালে উঠে ভাবতে থাকব—কই আমার চন্দনা পাখি তো ডাকছে না—খোকাবাবু ওঠো, খোকাবাবু ওঠো !"

banglabooks.in

আমি বললাম—"তখন কী করবি ?"

সে বলল—"কী আর করব ? হয়তো সমুদ্রের ধারে একা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবব—এই সমুদ্র পেরিয়ে যাই কেমন করে ? হয়তো রাজকুমারী আমার চোখের জল মুছিয়ে বলবে, কেঁদো না ! কিন্তু তবু মন কাঁদতে থাকবে ! তোরা হয়তো তখন ভুলে যাবি, কিন্তু আমি তোদের কথাই কেবল ভাবব আর কাঁদব।"

আমি বললাম—"সুরো, তবে তুই যাসনি।"

সুরো বলল—"সবাই তো যেতে মানা করছে, সবাই তো ছেড়ে দিতে কাঁদছে, কিন্তু তবু তো থাকতে পারছি না ভাই ! রাজকুমারীর ওই বাঁশির সুর যে প্রাণ টেনে নিয়ে চলেছে। ওই সেই বাঁশির ডাক ! নিপু, বিদায় দে ভাই। মনে রাখিস আমায় !" আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম—"না সুরো, না, যাসনি !"

আমার কান্নার দু ফোঁটা জল হাতে নিয়ে সে বলল—"এই আমার রইল—তোর স্মরণচিহ্ন !"

আমি আরও চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম—"না, না, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।" বলে তার হাত চেপে ধরলাম। সুরো আমার হাতটি বুকে খানিক চেপে চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল—"ওই আমার রথ এসেছে।" বলে সে আমার হাত ছেড়ে দিল। বলল—"আর তোকে ধরে রাখব না, তুই তোর মায়ের কাছে যা। আমায় বিদায় দে।" বলতে বলতে সুরো কোথায় মিলিয়ে গেল, আমিও যেন সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলাম। কী হল কিছু বুঝতে পারলাম না। কেবল শুনলাম মা যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে—"নিপু ! নিপু !"

"নিপু ! নিপু !"

আমি ধড়মড় করে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দেখলাম চোখের পাতা ভিজে।

"নিপু ! নিপু !"

আমি চোখ মুছে দেখি, মা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে।

"নিপু ! নিপু !"

banglabooks.in

মা বলল—"দেখবি আয়।"

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি সকালের সোনালি রোদে আকাশ ভরে গিয়েছে ; আর একখানি সোনালি চতুর্দোলায় ফুলে ফুলে সাজানো, ফুলের মালা গলায়, জরির জামা গায়ে, বরের বেশে চলেছে রাজপুত্র সুরজিৎ—যেন কোথাকার কোন রাজপুরী থেকে তার বধূ আনতে।

তারপর কত দিন ওই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি—কত বর কত বধূ নিয়ে ফিরে এল দেখলাম, কিন্তু সুরো তো কই তার সেই রাজকুমারী বধূকে নিয়ে আর ফিরে এল না।

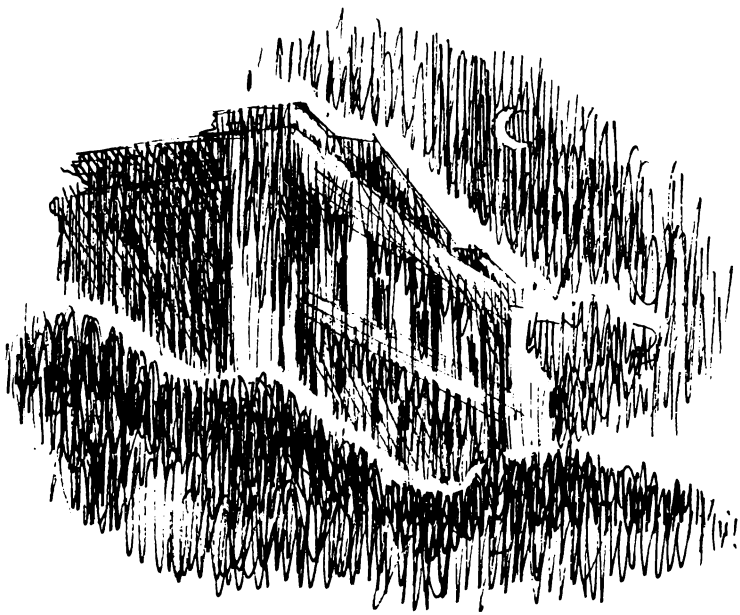

banglabooks.in

লাট্টুর ঘূর্ণি

এ আমার আরও ছেলেবেলাকার গল্প।

আমার দাদার ভারি লাট্টুর সখ ছিল। তিনি যেখানে যা পয়সা পেতেন, তাই দিয়ে লাট্টু ও লেত্তি কিনতেন। এমনি করে ছোট বড় কত রকম আকারের এবং লাল নীল প্রভৃতি কত রকম রঙের কত যে লাট্টু তাঁর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব লাট্টু নিয়ে, মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গোল দাগ কেটে, তার মধ্যে একটার পর একটা, একটার পর একটা লাট্টু ঘুরিয়ে তিনি যখন ফেলতেন, তখন মনে হত যেন দেখতে দেখতে মাটির বুকের উপরে একখানি ছোট্ট মরসুমি ফুলের খেত বিচিত্র রঙের ঝলমলানি নিয়ে গজিয়ে উঠল। লাট্টুর সেই শোভা এখনও যেন আমার চোখে লেগে আছে। দাদার মতন তেমনতর লাট্টু ঘোরাতে এ পর্যন্ত আমি আর কাউকে দেখলাম না। আমার চোখে তিনি ছিলেন লাট্টুখেলার ওস্তাদ শিল্পী।

দাদার দেখে দেখে আমারও লাট্টু ঘোরাবার খুব ইচ্ছে হত ; কিন্তু উপায় ছিল না। দাদা আমাকে লাট্টুর গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দিতেন না—পাছে লাট্টু খারাপ হয়ে যায়। লাট্টুকে তিনি যেন প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন।

banglabooks.in

তাদের কত আদর-যত্ন ছিল ; গায়ে একটু ময়লা লেগে থাকবার জো ছিল না। কোনও রকমে তাদের গায়ে একটু চোট লাগলে, মনে হত সে চোট বুঝি দাদার বুকেই লেগেছে। আমি বড্ড কাকুতি-মিনতি করলে, তিনি কখনও কখনও লাট্টুর গায়ে একটিবার আমাকে শুধু হাত বুলোতে দিতেন। লাট্টুর সেই স্পর্শটুকুতেই আমার যে কী আনন্দ হত ! কিন্তু তবু মন থেকে লাট্টুঘোরাবার লোভ ছাড়তে পারতাম না ! বাবা মা যে কেন আমায় একটা লাট্টু কিনে দেননি, তা আমি এখন ঠিক বলতে পারি না এবং আমিও যে কেন লাট্টুর জন্যে মায়ের কাছে কোনওদিন বায়না ধরিনি, তাও আমার মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে সেই ছেলেবেলায় লাট্টু ঘোরাবার কী ব্যাকুলতাই না বুকের মধ্যে ছটফট করে ঘুরে বেড়াত ! দাদা কিছুতেই লাট্টু ছুঁতে দিতেন না, বোধ হয় সেইজন্যেই ওই ব্যাকুলতা দিন দিন অত প্রবল হয়ে উঠেছিল—আমায় যেন খেপিয়ে তুলেছিল।

দাদা স্কুলে গেলে আমি সারা দুপুরটা বাড়িময় তার লাট্টুর গুপ্ত আস্তানা খুঁজে-খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু তিনি এমন করে লুকিয়ে রাখতেন, যে কিছুতেই তা বার করতে পারতাম না। মন আরও ছটফট করত। এমনিতর সারাদিন লাট্টু লাট্টু করে এক একদিন রাত্রে লাট্টুর স্বপ্ন দেখতাম। কী আনন্দ ! রাশি রাশি লাট্টু—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, আরও কত রঙের—যেন শিলাবৃষ্টির মতো আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে ! দু হাতে চেপে, বুক দিয়ে ধরে, সে লাট্টুর রাশি আঁকড়ে রাখা যায়না—উপচে উপচে পড়ে ! কিন্তু হায়, স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব লাট্টু মিলিয়ে যেত, আর তার সেই আনন্দও মুষড়ে আসত !

এমনিতর এবং আরও কত রকম লাট্টুর স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখতাম। এবং স্বপ্নের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হত যে এ তো স্বপ্ন ! কিন্তু তাতে লাট্টু পাওয়ার আনন্দ কিছুমাত্র কম হত না। কেবল এই দুঃখ হত যে ওই লাট্টুগুলোকে কিছুতেই স্বপ্নের আবরণ থেকে ছিন্ন করে আমার নির্জন দুপুরবেলাকার খেলাঘরের মধ্যে এনে ফেলতে পারছি না ! তখন এই পেয়েও না পাওয়ার জন্যে বুকটা হায় হায় করতে থাকত ; আর কেবলই মনে হত—স্বপ্ন কি সত্য হয় না ?— স্বপ্ন কী সত্য হয় না ?

banglabooks.in

banglabooks.in

একরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম—এক পরী এসে আমার কপালে একটি চুমু খেয়ে আমার হাতে একজোড়া লাট্টু দিলেন। কিন্তু পরী চলে যেতেই ওই লাট্টুজোড়া দু জোড়া পাখা বার করে আমার কাছ থেকে পাখির মতো উড়ে গেল। আমি এত ডাকলাম, আর ফিরে এল না। কী দুষ্টু! পরীর দেওয়া লাট্টু নিশ্চয় আসল লাট্টু। সে স্বপ্নের মতো নিশ্চয় ভেঙে যেত না। কিন্তু তারা ছিল দুষ্ট, তাই আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে নিজের যেখানে খুশি পালিয়ে গেল!

ছেলেমানুষের মনের দুঃখ দেখে বোধ হয় দেবতার দুঃখ হল। তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে ঢুকে আমি দাদার নতুন-পাওয়া প্রাইজ বইয়ের ছবি দেখছি, এমন সময় মাথার উপর খসখস একটা আওয়াজ হয়ে ঠিক সেই স্বপ্নে দেখা লাট্টু— বৃষ্টির মতো টপটপ করে তিন চারটে লাট্টু টেবিলের ওপরে এসে পড়ল। আর আমাদের কালো পুষিটা আলমারির ঠিক উপরে যে ছোট্ট ঘুলঘুলিটা আছে, তার থেকে লাফিয়ে, আলমারির মাথা হয়ে, টেবিলের উপরে পড়ে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুষিটা সোনার পুষি! তাকে সেদিন আমি কত আদর করলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর তার ল্যাজ ধরে টানব না। আমার পাত থেকে একটু করে মাছ তাকে রোজ দেব। যে লাট্টুর সন্ধান আমি এতদিন এত কষ্ট করেও পাইনি, এই পুষি সেই সন্ধান এক মুহূর্তে দিয়ে গেল!

আমি টেবিলের উপর দাদার বসবার টুলটা চাপিয়ে সেই ঘুলঘুলির নাগাল পেলাম। নাগাল পেলাম না তো, যেন হাতে স্বর্গ পেলাম! সেই অন্ধকার ঘুলঘুলির মধ্যেই দাদার লাট্টুর ভাণ্ডার! আরব্য উপন্যাসের চল্লিশ দস্যুর গল্পের গুহার মধ্যে লুকানো গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের মতোই যেন দাদার এই লাট্টুর ভাণ্ডার—থাকে থাকে সাজানো—লাল, নীল, নানা রঙের লাট্টু—হীরে মণিমাণিক্যের মতো জ্বলজ্বল করছে! তবে দাদার এই রত্নগুহার এই সুবিধে ছিল যে চল্লিশ দস্যুর গুহার মতো এর দরজা দিনরাত বন্ধ থাকত না এবং এর মধ্যে থেকে রত্ন লুটে নেবার জন্যে দরজা খুলতে কোনও মন্ত্রের দরকার হত না। তবে ধরা পড়লে, দস্যু সর্দারের হাতে কাশিমের মতো দাদার হাতে

banglabooks.in

আমার প্রাণটি যাবার ভয় ষোলো আনাই ছিল !

সেদিন দুপুর বেলাটা আমার কী আনন্দেই কাটল। এতদিনকার মনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। লাট্টুর জন্যে দাদার কাছে যত বকুনি খেয়েছিলাম, তার সমস্ত ব্যথা আজ যেন জুড়িয়ে গেল। আমি একটা লেত্তি নিয়ে ঠিক দাদার মতো করে লাট্টুর গায়ে জড়িয়ে, ঠিক তেমনই করে হাত ঘুরিয়ে, মেঝের উপর লাট্টু ফেলতে লাগলাম ! বার কয়েক লাট্টু ঘুরল না। কিন্তু আমি দাদার ভাই তো ! পাঁচ-সাতবারের পরই আমার হাতের গুণ বুঝে লাট্টু ঠিক ঘুরতে শুরু করল। সে যতই ঘোরে আমি ততই মেতে উঠি। এবং তার গুঞ্জনধ্বনি যতই কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, ততই মন আনন্দে লাফাতে থাকে। হঠাৎ দেয়াল ঘড়ি থেকে তিনটের ঘা খেয়ে আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি লাট্টুগুলোর গা থেকে ধুলো-ময়লা মুছে সেগুলোকে সেই ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রেখে, দাদার পড়বার ঘর থেকে পিট্টান দিলাম। দাদার যে এইবার স্কুল থেকে আসবার সময় হয়েছে !

এর পর থেকে আমার আর লাট্টুর দুঃখ রইল না ! এক ছুটির দিন ছাড়া, রোজ দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে আমি মনের সাধে লাট্টু ঘোরাতাম। কিন্তু এই দুঃখ হত যে একলব্যের মতো এই নির্জন সাধনায় আমি লাট্টুঘোরানোতে যে কত বড় ওস্তাদ হয়ে উঠেছি, তা দাদাকে দেখাতে পারলাম না ! আমার লাট্টু ঘোরানো দেখে দাদা যে কতখানি চমকে উঠবে, তা মনে মনে কল্পনা করেই আমি আনন্দ পেতাম।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল। দাদার স্কুল যাওয়া বন্ধ, আমার লাট্টু ঘোরানোও বন্ধ। মনের মধ্যে আবার তেমনই ছটফটানি শুরু হল। দাদার কাছে লাট্টু চেয়ে আবার তেমনই বকুনি খেতে লাগলাম ; আবার তেমনই ঘুমের ঘোরে আবোলতাবোল লাট্টুর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম।

যখন এমনি করে লাট্টুর শোকে মনের দুঃখে দিন কাটছে, তখন একদিন মামার বাড়ি থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ এল। ছোটমামার বিয়ে। সেদিন আমার পেটের অসুখ। মা কেবল দাদাকে নিয়েই সকালবেলায় নিমন্ত্রণ গেলেন। আমি ভুখাই-চাকরের কাছে পড়ে রইলাম। নিমন্ত্রণ যেতে পেলাম না বলে

banglabooks.in

সেদিন আমার একটুও দুঃখ হল না। বরং লাট্টু ঘোরাবার এই মহা সুযোগ পেয়ে মনটা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মা আর দাদা চলে যেতেই আমি সেই ঘুলঘুলি থেকে এক গাদা লাট্টু বার করে এনে মনের সাধে ঘোরাতে শুরু করে দিলাম। আজ আর ভয় নেই। সারাদিন তো নয়ই, রাত্রেও দাদা আজ বাড়ি ফিরবেন না—ফিরতে সেই কাল বিকেল। কী আনন্দ !—কী আনন্দ !

আমি সারাদিন লাট্টু ঘুরিয়ে, সেদিন আর লাট্টুগুলোকে ঘুলঘুলিতে তুললাম না। শোবার সময়, বিছানার চারদিকে সেগুলোকে সাজিয়ে রেখে, তার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। এ পাশে ফিরি লাট্টু, ও পাশে ফিরি লাট্টু, মাথার শিয়রে লাট্টু, পায়ের তলায় লাট্টু—কী মজা !

লাট্টুর কথা ভাবতে ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে একবার মনে হল—চোরে যদি লাট্টু চুরি করে নিয়ে যায় ? কী সর্বনাশ ? আমি ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্ট করলাম—লাট্টুগুলোকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে ; কিন্তু পারলাম না কিছুতেই ! গা একেবারে এলিয়ে রইল। তার পর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

এবার জেগে উঠে দেখি অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন এক টুকরো চাঁদের কুচি এসে পড়েছে ! ঠিক মোমে গড়া পুতুলের মতো একটি কচি ছেলে আমার বিছানা থেকে একটি লাল রঙের লাট্টু নিয়ে মেঝের উপরে বসে খেলা করছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা টানা দুটি বড় চোখ—ঠিক যেন আমার সেই ছোট ভাইটি, যে ভাই আমার মারা গেছে—যাকে আমি ভারি ভালোবাসতাম, যে মারা যেতে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কত কেঁদেছিলাম।

বুঝলাম ছেলেটি লাট্টু চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, তাকে চোর বলতে আমার ইচ্ছে হল না। অমন সুন্দর ছেলে কখনও চোর হয় ? ও যে আমার ছোট ভাইটি ! ও যদি লাট্টুগুলো আমার কাছে চায়, আমি এখনই সব দিয়ে দিতে পারি—তার জন্যে দাদা আমায় মেরেই ফেলুন, আর কেটেই ফেলুন !

আমি বিছানা থেকে নেমে তার কাছে যেতেই সে তার সেই টানা টানা চোখদুটি আমার পানে তুলে মিষ্টি মিষ্টি কথায় বলল—"দাদা, আমায় একটা

banglabooks.in

লাট্টু দেবে ?”

আমিও ঠিক এমনি করে দাদার কাছে লাট্টু চেয়েছি কতবার, আর তার বদলে পেয়েছি বকুনি কেবল। সে যে কী কষ্ট ! সে কষ্ট আমার মনে এখনও গাঁথা আছে। সে দুঃখ আমার এই নতুন পাওয়া ছোট ভাইটিকে আমি দিতে পারব না। আমি বললাম—“নাও ভাই তুমি লাট্টু—তোমার যেটা খুশি !” হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল। সে সেই লাল লাট্টুটি হাতে নিয়ে বলল—“আমায় এটা দিয়ে দিলে ?—একেবারে ?”

আমি বললাম—“হ্যাঁ ভাই !”

সে বলল—“জন্মের শোধ ?”

আমি বললাম—“হ্যাঁ, জন্মের শোধ।”

সে বলল—“কী মজা !—কী মজা !” বলে আনন্দে দুই হাত তুলে লাফাতে লাগল ; তার পর বলল—“দাদা তুমি লাট্টু ঘোরাও না, আমি দেখি !”

আমি মহা উৎসাহে একটার পর একটা লাট্টু নিয়ে বনবন করে ঘোরাতে শুরু করে দিলাম। নানা রঙের লাট্টু রাত্রের অন্ধকারের উপর বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে কালো রাত্রিটাকে যেন রঙিন করে তুলতে লাগল। আর তাদের ঘূর্ণির ঘন-গুঞ্জন স্তব্ধ বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ সুরের বাঁশি বাজিয়ে চলতে লাগল !

ছেলেটির কী আনন্দ ! আমি ঘুরন্ত লাট্টু মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার কাঁধে-মাথায় বসিয়ে দিই—তবু তারা ঘোরে দেখে সে অবাক ! কখনও সেই লাট্টু নিজের আঙুলের নখের ছোট্ট ঘেরটুকুর মধ্যে বসিয়ে রেখে তাকে ঘোরাই, কখনও মাটিতে না ফেলে শূন্য থেকেই ঘুরন্ত লাট্টু হাতের উপর তুলে নিই, কখনও দু হাতে দুটো লাট্টু নিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে না ফেলতেই এ হাতের লাট্টু, ও হাতে ধরে নিই, ও হাতেরটা এ-হাতে নিই এমন করে যত কসরত তাকে দেখাই, ততই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে—আর আমায় বাহবা দেয়।

তার এই বাহবাতে আমি মেতে উঠতে লাগলাম ; যত কিছু বিদ্যে দাদার দেখা-দেখি আয়ত্ত করেছিলাম, একবার নয় পাঁচ দশবার করে তাকে সব দেখাতে লাগলাম। তারও যেন দেখে আর সাধ মিটছিল না—যতই দেখে,

banglabooks.in

ততই তার আনন্দ, ততই তার বিস্ময়! লাট্টু ঘোরানো দেখিয়ে দাদাকে বিস্মিত করে দেব মনে মনে আকাঙ্খা ছিল, কিন্তু তা পারিনি। আজ এই নতুন পাওয়া ছোট্ট ভাইটিকে বিস্মিত করে দিয়ে সে ক্ষোভ আমার মিটল।

ছেলেটি বলল—"দাদা, তুমি কী চমৎকার লাট্টু ঘোরাও! কী সাফ তোমার হাত!"

আমি বললাম—"তুমি শেখো না—তুমিও ওই রকম পারবে!"

সে ছল ছল চোখে বলল—"কে আমায় শেখাবে?"

আমি বললাম—"কেন, আমি!"

সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি তার বাঁ হাতে লাট্টু, ডান হাতে লেত্তি দিয়ে তার হাতে ধরে তাকে লাট্টু ঘোরানো শেখাতে আরম্ভ করলাম। কী কোমল তার হাত দু খানি! কী বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল তার চোখ দুটি! সে অল্পক্ষণেই আমার কাছ থেকে লাট্টু ঘোরানো শিখে নিল। তার পর সে ঘরময় ছুটে ছুটে লাট্টু ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগল। সে তো ছোটাছুটি নয়—সে যেন আনন্দের ছন্দ ভরা অপরূপ নৃত্য! আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে ছেলেটি যেন লাট্টু-খেলার ভেলকি শুরু করে দিল। সে এমনই লাট্টু ঘোরাতে লাগল যে কখনও পাঁচ সাতটা লাট্টু মিলে যেন একটি ফুলের তোড়ার মতো গড়ে উঠল, কখনও যেন বিভিন্ন রঙে গাঁথা একগাছি ফুলের মালা হয়ে গেল। কখনও তারা এঁকেবেঁকে চলা নদীর স্রোতের মতো বহে গেল, কখনও যেন তারা সমস্বরে গেয়ে উঠল, কখনও বা হেলেদুলে নানা-ভঙ্গিতে নৃত্য করতে লাগল—আরও কত কী হল আমি বলতে পারি না; আমি নির্বাক হয়ে সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগলাম। এ কী যাদুকর? না মায়াবী?

চোখের সামনে নানা আকারে নানা ভঙ্গিতে ক্রমাগত লাট্টু ঘোরা দেখতে-দেখতে আমার মাথার ভেতরে যেন একটা ঘূর্ণি জেগে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল—যেন রাত্রি ঘুরছে, রাত্রির অন্ধকার ঘুরছে। আকাশ ঘুরছে, তারা-নক্ষত্র—তারাও ঘুরছে—সেই লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে, তারই তালে তালে! সে কী মহা ঘূর্ণি! মাথা ঠিক রাখা যায় না, পা ঠিক রাখা যায় না। মনে হল যেন আমি ঘুরতে ঘুরত ঠিকরে বিছানার উপর গিয়ে পড়লাম।

banglabooks.in

পরদিন দাদা নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে বাড়িতে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। তাঁর একটা লাল লাট্টু খোয়া গেছে। কে নিয়েছে—তাই নিয়ে মহা হইচই! আমি চুপ। আমি যে সেই লাট্টুটি গত রাত্রে আমার সেই ছোট ভাইটিকে দিয়ে দিয়েছি সেকথা আর সাহস করে দাদাকে বলতে পারলাম না। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। কুঞ্জদাসী দাদাকে বলে দিল যে কাল সে আমাকে লাট্টু নিয়ে খেলতে দেখেছে। দাদা আর কথাটি নয়, একেবারে ধাঁ করে এসে সজোরে একটি চড় আমার গালে কসিয়ে দিলেন। আমি সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়লাম—জ্ঞান হল কতক্ষণ পরে জানি না। জেগে দেখি মায়ের কোলে শুয়ে আছি—কপালে জলপটি বাঁধা। দাদা যে কোথায় দেখতে পেলাম না।

সন্ধ্যার দিকে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে আমার খুব জ্বর এল। মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন—"বাবা, তুমি ভালো হও, আমি তোমায় অনেক লাট্টু কিনে দেব।" মায়ের এই কথাগুলো আমার বেশ লাগছিল; কিন্তু জ্বরের আচ্ছন্নতায় তাঁর কোনও কথারই উত্তর দিতে পারলাম না। মা আমায় লাট্টু দেবেন—অনেক লাট্টু—রাশি রাশি লাট্টু—ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ঘুম ভেঙে দেখি আমার সেই কালকের ছোট-ভাইটি ঘরে এসেছে। কিন্তু আজ তার মুখখানি মলিন, কান্নার ভারে চোখ দুটি যেন বুজে আসছে। আমি বলতে গেলাম—তোমার কী হয়েছে ভাই? কিন্তু কথা কইতে পারলাম না; সর্বাঙ্গ জ্বরে এমনই ঝিমিয়ে ছিল! সে আস্তে আস্তে এসে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়াল। মা পাশে শুয়েছিলেন, তাঁকে ইসারা করে ডেকে বললাম—"দেখো মা, কে এসেছে!" কিন্তু তিনি যেমন ঘুমিয়েছিলেন, তেমনই ঘুমিয়ে রইলেন। আমার তো গলার আওয়াজ বার হয়নি, কেমন করে তাঁর ঘুম ভাঙবে?

ছেলেটি তার সেই ননির মতো নরম হাত দিয়ে অতি আস্তে আস্তে আমার সেই গালটি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল—যে গালে দাদা সজোরে এক চড় কসিয়েছিলেন। হাত বুলোতে বুলোতে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল। সে গুণগুন করে বলতে লাগল—"অ্যাঁ! এমনই করে

banglabooks.in

মেরেছে ! আহা, আমার জন্যেই তোমায় মারলে ! না জানি তোমার কত লেগেছে !”

কী মিষ্টি তার স্পর্শ ! কী মিষ্টি তার গলার স্বর। আমার ভারি ভালো লাগছিল তার সেই হাত বুলানো, তার সেই কথা শুনতে। কত কথা তাকে বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।

টুপ করে আবার এক ফোঁটা চোখের জল আমার গায়ে পড়ল। আমি বললাম—“কাঁদো কেন, ভাই ?” সে শুনতে পেল না। সে মনে করল আমি বুঝি ঘুমিয়ে আছি। কিন্তু আমি যে জেগে, সে কথাও তাকে বোঝাতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম—ছোট ভাই না হলে দাদাকে এমনতর ভালোবাসে কে ? সে আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগল, আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমার জ্বর ছেড়ে গেল।

banglabooks.in

ভুখাই চাকর বিছানা রৌদ্রে দিতে গেলে দাদার সেই হারানো লাল লাট্টুটি বেরিয়ে পড়ল। সে বলল—আগের দিন আমি যখন লাট্টু নিয়ে ঘুমোই, তখন কী রকম করে একটা লাট্টু গড়িয়ে খাটের গদির পাশে ঢুকে গিয়েছিল।

সকলে সমস্বরে বলল—তাই হবে। কিন্তু আমার মন বলল—আমার সেই ছোট ভাইটি পাছে দাদা আমায় আবার মারে, সেই দুঃখে ওই লাল লাট্টুটি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন সে ফিরিয়ে দিল?

দাদা না হয় মেরেছে, কিন্তু আমি তো সে জন্যে একটুও দুঃখ করিনি, আমার সেই ছোট ভাইটির উপর অভিমান করিনি। তবে কেন সে লাট্টু ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

সে কী জানেনা, কত আদর করে ওই লাট্টুটি আমি তাকে দিয়েছিলাম! সে ফিরিয়ে দিতে আমার কত দুঃখ হয়েছে! আমি যদি জানতাম, সে লাট্টু ফিরিয়ে দিতে এসেছে, কখনও তাকে ফেরাতে দিতাম না—হাতে ধরে তাকে সেটা আবার ফিরিয়ে দিতাম।

অসুখ সারবার পর মা আমায় অনেক রকমের অনেক লাট্টু কিনে দিয়েছিলেন, সেসব লাট্টু আমি খুব যত্নের সঙ্গে তুলে রেখেছিলাম। যেদিন আবার আমার সেই ছোট ভাইটি আসবে, তাকে সবগুলো দিয়ে দেব। কিন্তু সে তো আর একদিনও এল না। কেন?

banglabooks.in

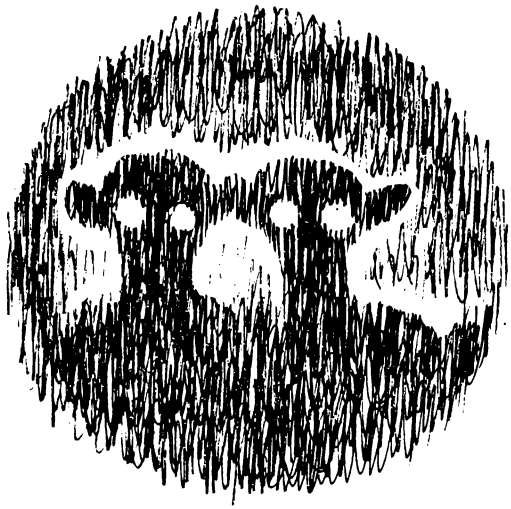

কঙ্কালের টঙ্কার

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতাম। আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন। বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন। মাস্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকরা না ছেপে ফেরত দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল সে শুধু আমার ওই কবিত্ব শক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কবিতা আমার প্রাণ রক্ষা করল কেমন করে ? সত্যি বলছি সেদিন কারও সাধ্য ছিল না যে মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে ! ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলাম তাই বেঁচে গেলাম। নইলে লোকের অত্যাচরে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্য বয়সে বিদায় দিলে, সেদিন আমার যে কী অবস্থা হত তা আমিই জানি। গল্পটা তাহলে খুলেই বলি।

নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলাম জয়পুর থেকে দিল্লি। টাইম-টেবল খুলে দেখলাম, টানা দিল্লি যেতে হলে রাত্রের গাড়িটাই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত ! তার ওপর রাত্রি দুটো—এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় কী ? আমি স্টেশন-

banglabooks.in

মাস্টারকে বললাম—'কী উপায় করা যায় বলুন দেখি ? এই দারুণ শীতে ভোররাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।'

স্টেশন-মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কী ফাস্ট ক্লাস প্যাসেনজার ?'

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল কোম্পানি আধা ভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়মানুষি করছিলাম। বুক ফুলিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, আমার ফাস্ট ক্লাসের টিকিট।'

স্টেশন-মাস্টার বললেন—'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভালো ব্যবস্থা আছে।'

আমি বললাম—'কী ?'

তিনি বললেন—'আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে স্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফাস্ট ক্লাস গাড়ি ওই সাইডিঙে কেটে রেখে দেব, আপনি তাতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে তাতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেব—আপনি দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে দিল্লি গিয়ে পৌঁছবেন।'

আমি বললাম—'বাঃ, এ তো বেশ !'

স্টেশন-মাস্টার বললেন—'হ্যাঁ, শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানি বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।'

আমি বললাম—'খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি তাহলে আটটার মধ্যেই আসব—আপনি গাড়ি ঠিক রাখবেন।'

তিনি বললেন—'গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরি করবেন না। আটটার পর আর ট্রেন নেই বলে আমরা আটটার সময় স্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।'

আমি বললাম—'আটটার মধ্যেই আসব।' বলে আমি চলে গেলাম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিন জোড়া ডবল মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্ল্যানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েস্ট কোট, কোট, ওভার কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোশ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে

banglabooks.in

কানঢাকা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় স্টেশনে এসে হাজির হলাম। আমার মস্ত বড় লোহার তোরঙ্গটা দুজন কুলি এসে ধরাধরি করে নামাতে গিয়ে একজন ফিক করে একটু হেসে ছেড়ে দিল।

আমি বললাম—'কেয়া হল রে ?'

সে বলল—'বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু একটো ধুতিউতি আছে, সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটা আমাদের বখশিশ করে যান বাবু—আপনার কুলিভাড়া, রেলমাশুল অনেক বেঁচে যাবে।'

আমি বললাম—'যা, যা, তোমকো আর ইয়ে করতে হবে না !' বলেই আমি হনহন করে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলাম। স্টেশন-মাস্টার আমায় দেখেই বললেন—'গুড ইভনিং বাবু ! আপনার ভাগ্য খুব ভালো—আজ আর কোনও প্যাসেনজার নেই। সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার ! চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।' বলে তিনি আমাকে নিয়ে প্লাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল লাইন টপকে, অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলাম একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে !

মাস্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বললেন—'নিন—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।' বলেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত বাতিটা তুলে নিয়ে 'গুড নাইট' বলে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলাম না, রেল লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খসখস শব্দ কেবল শুনতে লাগলাম। ছ্যাঁৎ করে আমার মনে হল—তাইতো, মাস্টারবাবু অমন করে পালালেন কেন ?

ইতিমধ্যে দেখি কুলি দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে—'বাবুজি পয়সা।' আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুটে দিল স্টেশনের দিকে। ব্যাপার কী ? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লামাখা কালো ভূত রেল লাইনের বাঁধের নিচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে

banglabooks.in

স্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিল। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ ! একেবারে অন্ধকার !

অমাবস্যার রাত্রি—চরিদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক ওদিক চারদিক দেখতে লাগলাম—আশেপাশে কেউ নেই। দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভেতরটা কেমন ছমছম করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলাম। গাড়ির ভেতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাতড়ে বিজলি বাতির চাবি টিপলাম—খুট করে শব্দ হল, আলো হল না। সর্বনাশ ! আলো নেই না কি ? আলোর সুইচ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলাম, কোনও ফল হল না, যেমন অন্ধকার তেমনই ! পকেট খুঁজলাম, দেশলাই নেই। কেমন করেই বা থাকবে ? আমি তো চুরুট খাই না—লুকিয়েও না। হয়তো তোরঙ্গের মধ্যে একটা দেশলাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলাম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল। বালাপোশ, ওভারকোট, কোট, ওয়েস্টকোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে গাছটা হারাল কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে বিদেশ বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায় ! সেটাকেও শেষে খোয়ালাম ? সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগল। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মতো মানুষের বুককে এমন করে পিষতে থাকে—এ আমি জানতাম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক ওদিক করে ছটফট করতে লাগলাম ! মনে হল যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগল—চোখের সামনে নানা রকম ছায়া দেখতে লাগলাম, কানে কাদের সব ফিসফিস কথা এসে লাগতে লাগল ! কোথায় একটু আলো পাই ? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠকঠক করে সজোরে ঠুকতে লাগলাম—যদি একটু আলোর ফিনকি পাই ! কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথর কুচির ফিনকি এসে আমার চোখ দুটোকে ঝনঝনিয়ে দিল !

আমি দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্টেশনের দিকে ছুট দিলাম—যেমন করে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। স্টেশন-মাস্টারটা

banglabooks.in

কী পাজি ! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না ! বলল কিনা, দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে যাবেন ! পাজি কোথাকার ! আমি ছুটতে-ছুটতে একেবারে স্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালাম—প্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সামনে। কিন্তু এ কী ? এই তো সেই খেজুরগাছ। এই তো—এই তো রয়েছে। কিন্তু স্টেশন কোথায় ? আমি এদিক-ওদিক চারদিক চেয়ে দেখলাম—স্টেশন নেই। মনে হল কালো স্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে ঠিক তেমনই করে অন্ধকারের গা থেকে স্টেশনটাকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে ! আমার বুকটা ধক করে উঠল। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলাম—যে পথে এসেছিলাম সেই পথে, আমার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ ছয়টা লাইন টপকে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কী সর্বনাশ !

আবার ভালো করে চারদিক চেয়ে দেখলাম—স্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে ! এখন উপায় ? এই রাত্রে আশ্রয় পাই কোথা ? করি কী ? একবার মনে হল, যাই, আর একবার গিয়ে ভালো করে স্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু স্টেশনের দিকটার সেই খাঁ খাঁ মূর্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ছেলেবেলায় গল্পে শুনতাম দৈত্যদানোরা রাতারাতি বড় বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেত—এ কী তাই হল নাকি ? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হল এমন করে রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচমকা একখানা গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে ! যেই এই কথা মনে হওয়া তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলাম ! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন ! সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই ! আমার এই

banglabooks.in

ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এক গাছতলায় এসে পড়লাম। মনে হল প্রাণটা যেন বাঁচল। ট্রেন চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। মনে হতে লাগল—কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলাম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিমঝিম করতে করতে আরও নিঝুম হয়ে আসছে। আর রাত্রের অন্ধকারটা তার কালো গায়ের উপর চামচিকের ডানার মতো একখানা কালো কুতসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে দেখতে আমি সুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলাম। কালো জুতো মোজা পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু করে মুছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোশ মোড়া গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগল। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না—তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললাম। চোখ বুজে মনে হতে লাগল—আমি আছি কি নেই? আছি কি নেই?

'আছে, আছে—এইখানে আছে—' বলে কানের কাছে কে একজন চিৎকার করে উঠল। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইশারা করে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আর একটা!

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট করে আমায় দেখতে লাগল। তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলাম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কটকট করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করল—'এই নাকি সে?'

প্রথম কঙ্কালটা বললে—'সে না তো কে?'

banglabooks.in

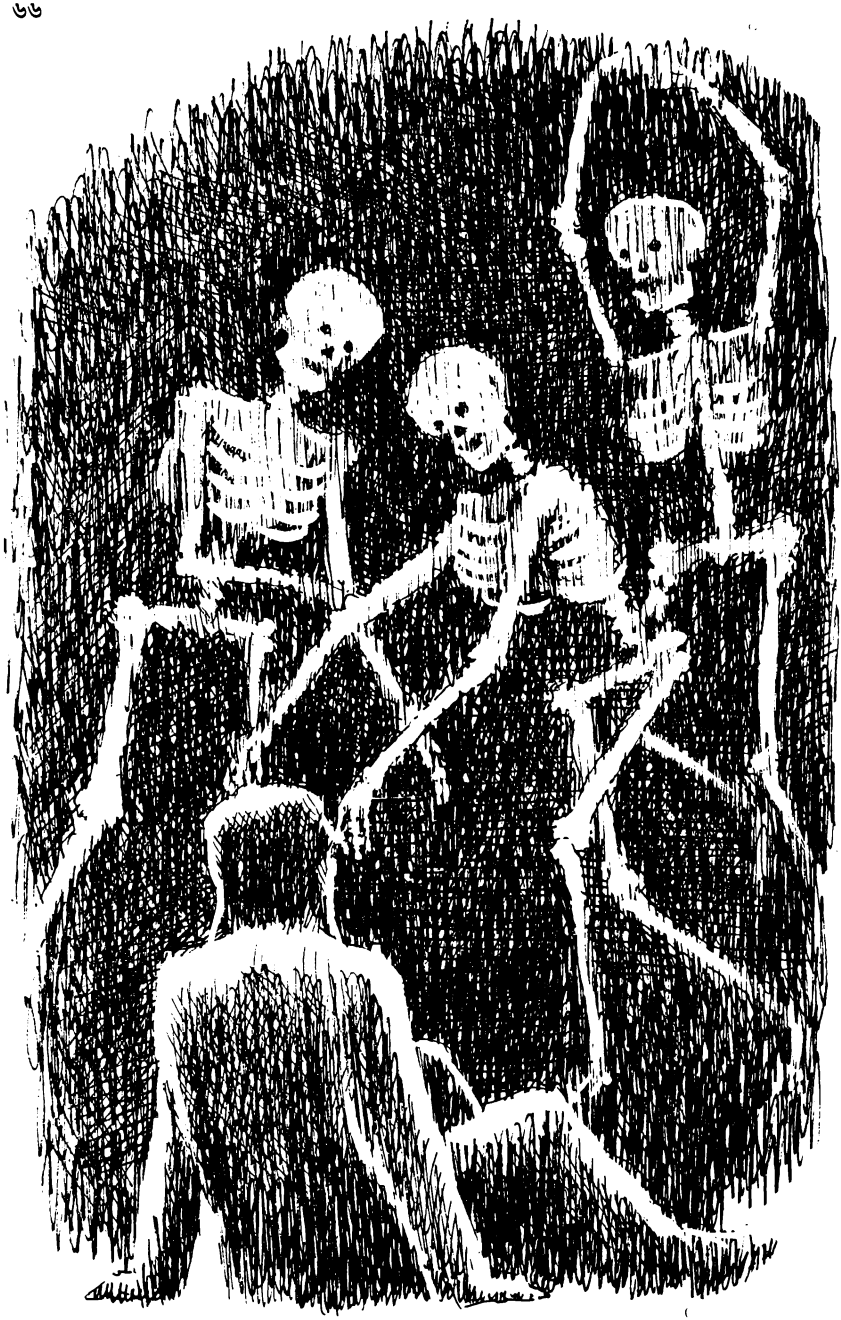

banglabooks.in

দ্বিতীয়টা বলল—'বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই !'

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বলল—'কই দেখি !' বলে তার হাড় বার করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগল।

'ও আর দেখছিস কী ? ও সেই ! আমার চোখে কী ধুলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না !' বলে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ করে বিকট শব্দে হেসে উঠল। মুখের ভেতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরল !

শেষ কঙ্কালটা বলল—'তবে একটু পরখ করে নেওয়া ভালো। কী জানি, যদি ভুল হয়।' প্রথম কঙ্কাল বলল—'নে, আর পরখ করতে হবে না ; ও দিকে লগ্ন বয়ে যায়।' বলে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল ! আমি ভাবলাম—ব্যস, এইবার আমার শেষ !

দেখতে দেখতে বাকি দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা দুখানা ধরল, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরল। তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চ্যাংদোলা করে আমায় তুলে ফেলল। আমি তাড়াতাড়ি দু হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলাম—'কোথায় নিয়ে যান মশাই !'

তারা বলল—'বিয়ে দিতে !'

আমি চমকে উঠে বললাম—'বিয়ে দিতে কী মশাই ! এই বুড়ো বয়সে ?'

একজন বলল—'বুড়ো বরই আমরা পছন্দ করি।'

আমি বললাম—'মশাই, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন !' প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে বলে উঠল—'তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে ? তোমাকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেব।'

আমি বললাম—'আমি তো মশাই পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছোটবেলায় একবার পালিয়েছিলাম বটে ; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।'

সে বলল—'আমরাও পুলিশ এসেছি, ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেব বলে।' আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—'কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে

banglabooks.in

পারব না।'

'পারবে না কী? বিয়ে তোমায় করতেই হবে।'

'এমনকী তোমার গোঁ?' বলে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন করে উঠল।

আমি বললাম—'রাগ করেন কেন মশাই! আমি ছাড়া কি পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশি হয়ে বিয়ে করবে।'

সে বলল—'এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথা? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না! চলো লগ্ন বয়ে যায়।'

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম—'তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?'

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বলল—'দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা।'

আমি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—'ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই, আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্তী।'

প্রথম কঙ্কালটা হো হো করে হেসে উঠে বলল—'রাধে মাধব। রাধে মাধব।'

আমি বললাম—'সে কী মশাই?'

সে বলল—'এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শেয়াল-কুকুর থাকে না আর মাধব চক্রবর্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের।'

আমি বললাম—'এই তো আমি রয়েছি!'

সে বলল—'আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভেতর থেকে কথা কইলেই কি তুই মাধব চক্রবর্তী হয়ে যাবি?'

আমি বললাম—'সে কী মশাই! মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভেতর আবার কে এল?'

সে বলল—'আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কী আমি টের পাইনি ভেবেছিস?'

banglabooks.in

আমি বললাম—'এসব কী হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এল তো মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা?'

সে বলল—'আরে ভাই বামুনের ছেলে সে বৈকুণ্ঠে গেছে।'

আমি বললাম—'না মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?'

সে বলল—'মরেছে না তো কী!'

আমি বললাম—'মরেছে কী রকম! সে মরে গেল আর টের পেল না?'

সে বলল—'মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে কী তা টের পায় না কি!'

কথাটা শুনে বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলাম নাকি—অ্যাঁ? সেই যে দেখলাম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগল। হয়তো এ আমি নই—এ আর কারও আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতাম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনও তা পারে? কিন্তু মারা গেলাম কেমন করে? আমার তো কোনও রোগ হয়নি। হয়তো ওই বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুলিয়ে যেতে লাগল। কেমন মনে হতে লাগল—না, আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এরা ঠিকই বলেছে—কাঙালিচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতে আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের বুঝি এখনও চলছে। কিন্তু কাঙালিচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালিচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন? এরা তো চিনতে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা বলে উঠল—'কী হে ক্যাংলা, কী ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হল?'

আমি বললাম—'আচ্ছা মশাই, আমি কী সত্যিই কাঙালিচরণ?' সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলল—'সে কীরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস না?'

banglabooks.in

আমি বললাম—'না।'

সে বলল—'সর্বনাশ হয়েছে। তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?'

আমি বললাম—'একটুও না।'

সে বলল—'তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে?'

আমি বললাম—'কই, আমার তো কোনও বিয়ের কথা হয়নি!' সে বলল—'সে কীরে! তোর গায়ে গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?'

আমি বললাম—গায়ে গোবর কাকে বলে? সে বলল—'তুই অবাক করলি! তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠবার জন্যে। তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী বর-পণের কড়ি বাচছিল। তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পাসনি, সেও তোকে দেখতে পায়নি। তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি রাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক করে লেগে গেল। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বললি—ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে কেন— কী হয়েছে? তুই বললি, ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কী? তুই বললি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলে তুই কপাল চাপড়াতে লাগলি! এসব তোর মনে পড়ছে না?'

আমি বললাম—'মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলাম। তারপর কী হল?'

সে বলল—'সর্বনাশ করলি! তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন। এসে বিধেন দিলেন যে রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত একে সাতশো বার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁতলে দে, তা হলেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বললি—ওরে বাপরে! রাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা! সে আমি পারব না! বলে তুই ছুট দিলি।'

আমি বললাম—'তার পর?'

সে বলল—'তার পর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে

banglabooks.in

খুঁজতে এই শ্মশান ঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস। হাঁরে এই মাধব চক্রবর্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়? তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?'

আমি বললাম—'মাধব চক্রবর্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সে বলল—'তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস? না মসকরা করছিস?'

আমি বললাম—'তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।'

সে বলল—'তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে!'

আমি বললাম 'মানুষে পেয়েছে কী গো! সে বলল,—'জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষেও তেমনই আমাদের কারও কারও ঘাড়ে চাপে, তুই যখন মাধব চক্রবর্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।'

আমি বললাম—'তাতে কী হয়?'

সে বলল—'মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোলতাবোল বকে, কটমট করে চোখ ঘুরাতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনই হয়। তাই তো তুই অমন করছিস—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।'

আমি বললাম—'ও, তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা বলে চিনতে পারছি না। ওগো তবে আমার কী হবে?'

সে বলল—'যেমন বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছিস, তেমনই ঠিক জব্দ!'

আমি বললাম—'ওগো, আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করব—আমাকে তোমরা উদ্ধার করো।'

সে বলল—'তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।'

আমি বললাম—'বেরব কী করে গো?'

সে বলল—'পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুশকিল করলি দেখছি। এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্তীর ওই কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায়

banglabooks.in

একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুত করে বেরিয়ে আসতে পারবি।'

আমি আঁৎকে উঠে বললাম—'ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না!'

সে বলল—'ভয় কী! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনও ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।'

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললাম—'না গো না—সে আমি পারব না! গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।'

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মতো চোখ দুটোকে বনবন করে ঘুরিয়ে বলল—'কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলাম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—'কী করব, আমার যে ভয় করছে!' সে দাঁতের দু-পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠল—'ফের ওই কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি!'

আমি বললাম—'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে!'

সে আরও রেগে বলল—'হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ!' বলে সে তেড়ে আমায় মারতে এল।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বলল—'রাগ করেন কেন খুড়োমশাই! ও হয়তো ক্যাংলা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?'

খুড়োমশাই বললেন—'কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বচ্ছর টিকটিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে?'

শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বলল—'যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ করে দেখতে ক্ষতি কী দাদামশাই?'

দাদামশাই বললেন—'আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা হোক!' বলে আমার দিকে ফিরে বললেন—'কী হে, তুমি মাধব চক্রবর্তী না কাঙালিচরণ?'

banglabooks.in

আমি বললাম—'আজ্ঞে, আগে তো জানতাম আমি মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু তার পর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালিচরণ।'

সে বলল—'কাঙালিচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ বলে তোমায় শাস্তি নিতে হবে—তোমায় ফাঁসি দেব আমরা, এই শ্মশানে এই গাছের ডালে!'

আমি বললাম—'আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্তী!'

সে বলল—'বেশ, মাধব চক্রবর্তী বলে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাব।'

'আর যদি না পারি?'

'তাহলে এইখানে তোমার ঘাড় মটকে রেখে চলে যাব!'

'ঘাড় মটকে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভূঁয়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্তিরে নিজেকে কী করে প্রমাণ করব মাশাই?'

'না পার, ঘাড়টি মটকে দেব—শ্মশানের ভূত হয় থেকো।'

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বলল—'কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনও চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্তী!' আমি বললাম—'আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।'

সে হেসে বলল—'ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোনও ভেতরের প্রমাণ দিতে পার?'

আমি বললাম—'আমার ভেতরে কী আছে না আছে আমি তো জানি না মশাই! এই দেখুন না, আমার ভেতরে কাঙালিচরণ আছে, কী মাধব চক্রবর্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।'

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—'কাঙালিচরণ হলে তোমায় ফাঁসি দেব কিন্তু।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—'আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্তী!'

সে বলল—'শিগগির প্রমাণ করো, নইলে ঘাড় মটকালাম বলে।'

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বলল—'অমন ভেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোনও গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী?'

banglabooks.in

আমি বলে উঠলাম—'হ্যাঁ, আছে বই কী ! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি !'

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বলল—'তুমি কবিতা লিখতে পার ? নিজে লেখো ? না পরের কবিতা নিজের বলে চালাও ?' আমি বললাম—'না মশাই, আমি সে রকম কবি নই !'

সে বলল—'তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয় ?'

আমি বললাম—'না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।'

সে বলল—'ভয়ে ছাপেন না কী রকম ?'

আমি বললাম—'আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।'

সে বলল—'আচ্ছা ! কই দেখি, একটা কবিতা লেখো দিকিন।' আমি তখনই আমার ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার করে বললাম—'আলো একটা চাই যে !'

সে বলল—'দিচ্ছি আলো।' বলে খানিকটা ধুলোবালি একত্র করে একটা ফুঁ দিল আর অমনি আগুন জ্বলে উঠল। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলাম। খানিকটা লিখেছি, সে বলল—'কই, কী লিখলে পড়ো।'

আমি বললাম—'এখনও যে শেষ হয়নি মশাই !'

সে বলল—'কবিতার আবার শেষ আছে নাকি ? যা লিখেছ পড়ো—ফাজলামি করতে হবে না।'

আমি সুর করে পড়লাম—

পড়িয়ে বিপদে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা !
উদ্ধার এ দুঃখ কারা-
গার হতে মা জননী।
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-চাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখি,

banglabooks.in

শূন্য হেরি এ ধরণী !
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা
দিয়ে তোর পা-তরণী !

এইটুকু শেষ হতেই সে বলল—'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে ! এ রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা, না পুরনো গান একটা মুখস্ত ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ ?'

আমি বললাম—'না মশাই এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাটকা। এতে আপনি পুরনোর গন্ধ কোথায় পেলেন ? দেখছেন না একেবারে আধুনিক ধরনে লেখা !'

সে বলল—'থামো, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরনো একটা গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ, তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ ! আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার ?'

আমি বললাম—'খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে আমি প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কী বলুন, আমি এখনই লিখে দিচ্ছি।'

সে বলল—'আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট করে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুই !'

আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বলল—'কী লিখলে, পড়ো হে ! আমি ও বড় কবিতা দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

আমি বললাম—'মশাই, আর একটু সময় দিন।' বলে আমি ঘসঘস শব্দে লিখে যেতে লাগলাম।

একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বলল—'উঃ অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়ো।'

অগত্যা আমি পড়লাম—

রেল আছে, জেল আছে,

banglabooks.in

আর আছে কদবেল ;
পাশ আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল ;
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সারখেল
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল !

পড়া শেষ হতেই সে চিৎকার করে উঠল—'বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে ! আর একবার পড়ো তো, আর একবার পড়ো তো।'

আমি আর একবার চিৎকার করে পড়লাম—'রেল আছে, জেল আছে ইত্যাদি।'

সে আবার বলল—'বেশ হয়েছে ! চমৎকার হয়েছে ! যাও, প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী !'

আমি বললাম—'ঠিক বলছেন মশাই, আমি কাঙালিচরণ নই ?'

সে বলল—'কাঙালিচরণের চোদ্দোপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্তী না হলে এমন কবিতা লেখে কে ?'

আমি বললাম—'মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন, এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের শীত সম্বন্ধে।'

সে বলল—'কই, শোনাও তো দেখি !'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের পাতা হাতড়ে কবিতাটা বার করে পড়তে শুরু করলাম—

বস্তা বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড় !
লেপ গদি বালাপোশ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড় !
ঊর্ধ-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিংবা কোন পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা

banglabooks.in

তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকায় করিছে কোতল !

অথবা কী মেঘ দৈত্য ছোড়ে শার্পনেল—

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠল—'ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে !' আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি 'রাম ! রাম !' বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লাম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসেনি, কে জানে ! আমি রেল লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বলল—'বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?'

আমি আর কী বলব ? বললাম—'আমি এখানে ওই ইয়ে হচ্ছিল কি না তাই একটু দেখছিলাম।'

তারা বলল—'আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ওই ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।' বলে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিল। আমি গাড়িতে উঠে বললাম—'হ্যাঁরে, গাড়িতে আলো নেই কেন ?'

সে বলল—'বিজলি বাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।'

আমি বললাম—'আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস—বখশিশ দেব।'

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিল। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলাম।

banglabooks.in

অতিথির আবদার

আমি কিছুদিন খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে ছিলাম। অর্থাৎ প্রতিদিন যত রাজ্যের খবর সংগ্রহ করে আমাকে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করতে হত। সত্যের সঙ্গে খানিকটা কল্পনা এবং কল্পনার সঙ্গে খানিকটা সত্যের রসান দিয়ে নীরস হাড় বার করা খবরগুলোকে নধর এবং সরস করে তোলাই আমার কাজ ছিল। এইটুকু পারি বলেই সাংবাদ সাহিত্যে আমার এতখানি আদর এবং প্রতিষ্ঠা।

সেদিন সারাদিন সারা শহরটা ঘুরে দু চারটে ছুটো তুচ্ছ খবর ছাড়া বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি ! সেই জন্য মনটা তেমন ভালো ছিল না। একে শ্রান্ত দেহ, তার উপর অবসন্ন মন নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম তখন সমস্ত দেহ মনে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু পারলাম না, সামনে যে কাজ ! যে খবরগুলো সংগ্রহ করেছি কোনও রকমে গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে সেগুলো ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেবার মতলবে কলম নিয়ে বসে গেলাম।

একটা খুনের খবর ছিল। কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে এক গ্রামে

banglabooks.in

একটা ভীষণ খুন হয়েছিল। কিন্তু খবরটা এমন প্রহেলিকাময় ধোঁয়াটে যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলা শক্ত। কে যে খুন করেছে, কাকে খুন করেছে এবং কেনই বা খুন করেছে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পুলিশ এ পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং আমিও আবিষ্কার করতে পারিনি। যে ঘরে খুন হয়েছে সেখান থেকে একটা জিনিসও চুরি যায়নি, একটা বাক্স-প্যাঁটরাও ভাঙা হয়নি। তা হলে খবর দেবার আর কী আছে? এক লাইনেই খুনের সব খবর শেষ হয়ে যায়। খুন তো প্রত্যহ হয় না, কাজেই এই খবরটাকে এক নিশ্বাসে শেষ করে আমার খবর রচনার প্রতিভাটাকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হল, চুরি তো হয়েছে! যারা খুন করেছে, তারা আর কিছু চুরি করেনি বটে, কিন্তু যাকে খুন করেছে তার মাথাটা তো কেটে নিয়ে গেছে। নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী? খামকা একটা মানুষের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে চোরের যে কী লাভ হতে পারে তার সূক্ষ্ম তত্ত্বটা কিছুতেই মাথায় আনতে পারছিলাম না। কিন্তু তা বলে তো খবরটাকে ছাড়া চলবে না—কোনও একটা বিশেষ সূত্র অবলম্বন করে খবরটাকে রীতিমতো লোমহর্ষক করে তুলতে হবেই।

বেশ নিবিষ্ট মনে লিখতে বসে গেলাম। সামনে কেরোসিনের বাতিটা টিমটিম করে জ্বলছিল, টেবিল ঘড়িটা টিকটিক শব্দে চলছিল। রাতের নিস্তব্ধতা ক্রমেই বেশ জমাট হয়ে আসছিল। আমি ঘরের মধ্যে একলাটি বসে খুনের একটা লোমহর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে চলেছিলাম। মুণ্ডচ্ছেদের ব্যাপারটা ক্রমেই এমন ঘোরালো হয়ে উঠছিল যে সেই গভীর রাত্রে একলা ঘরে বসে নিজের লেখা বিবরণে নিজেই চমকে চমকে উঠছিলাম। শেষে গায়ের ভেতরটা কেমন শিরশির করতে লাগল—কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল যেন মাথাটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ওই ভীষণ খুনটা যেন নিজের চক্ষে দেখছি। সামনে যেন রক্ত গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, একটা দুশমন কার ঘাড়টা ধরে, তার জ্যান্ত মুণ্ডুটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে নিচ্ছে—উঃ! আমি আর থাকতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি খুনের বর্ণনা লেখা কাগজগুলো চাপা দিয়ে চোখ বুজে ফেললাম।

banglabooks.in

হঠাৎ একটা জোর ফুঁ দিয়ে কেরোসিনের ছোট্ট টিমটিমে বাতিটা কে নিভিয়ে দিল। মানুষের গলা টিপে ধরলে যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, টেবিল ঘড়িটা তেমনিতর একটা বিশ্রী আওয়াজ করে একেবারে নিসাড় হয়ে গেল—তার বুকের টিকটিক আওয়াজ আর শোনা গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চড়াই পাখি কড়ি কাঠের ফাঁক থেকে কী একটা টুপ করে ঠিক আমার সামনেটিতে ফেলে দিল। মনে হল যেন একটি ছোট মটর দানা।

অন্ধকারে সেই মটর দানাকে দেখতে দেখতে ক্রমে সেটা একটা প্রকাণ্ড মাথার মতো হয়ে উঠল! ধড় নেই, শুধু গলা কাটা মুণ্ডু! মাথা ভরা মস্ত বড় বাবরি চুল। বড় বড় দুটো গোল চোখ লাল টকটক করছে। চওড়া কপালখানা মিশ কালো—তার উপর রাঙা সিঁদূর দিয়ে একটা ত্রিশূল আঁকা। এই এত বড় জোড়া কালো গোঁফ—দুদিকে পাকানো। গালপাট্টা দাড়ি! ঠিক যেন মনে হল মা দুর্গার প্রতিমার হাতের অসুরের মুণ্ডুটা। আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে।

আমি ভয়ে একটু পেছিয়ে যেতেই, সে তার বড় বড় চোখ দুটো বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠল—"ভয় পাও কেন?"

আমি আর কথার জবাব দেওয়া নয়, সাঁ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে আমার শোবার খাটিয়ায় এসে বসলাম! সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা টেবিল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে একেবারে আমার খাটিয়ায় এসে হাজির হল। বলল—"শোনো না!"

আমি আর বিলম্ব নয়, খাটিয়া থেকে দৌড়ে আবার চেয়ারে এসে বসলাম। সেও লাফাতে লাফাতে খাটিয়া ছেড়ে, টেবিলের উপর ঠিক মুখের সামনেটিতে এসে বসল। বলল, "একটু স্থির হও না।" বলে ক্রমেই সে আবার কাছে ঘেঁসে আসতে লাগল।

আমি এবার চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় এসে ধপ করে শুয়ে একেবারে লেপের মধ্যে প্রবেশ করলাম—আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে!

সে বলল—"অমন করছ কেন? হল কি তোমার?"

আমি লেপের মধ্যে থেকে বললাম, "আমার কিছু হয়নি। তুমি এখান থেকে বেরোও!"

banglabooks.in

banglabooks.in

সে বলল—"আচ্ছা অভদ্র তো তুমি ! তোমার ঘরে অতিথি এল, তাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ? এই তোমার শিক্ষা ?"

আমি কোনও জবাব দিলাম না। সেই নাছোড়বান্দা বাবরি চুলওয়ালা মুণ্ডুটা আমার লেপ মুড়ি দেওয়া দেহের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। এমনি থাকলে, সে নিরুপায় হয়ে আপনিই পালাবে ভাবলাম। কিন্তু কী সর্বনাশ ! হঠাৎ দেখি, লেপের কোনও একটা ফাঁক আবিষ্কার করে সে সুড়ুত করে আমার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—একবারে আমার বুকের উপর এসে বসেছে ! আর সেই কালো গালপাট্টা ভরা মুখের ভেতরকার সাদা সাদা দাঁতগুলো বার করে সে হেসে বলল—"কী বড্ড যে লুকিয়েছিলে ?" বলে সে বিকট শব্দে হেসে উঠল। আমি সেই হাসির শব্দে আঁতকে উঠে হাতের এক ঝাপটায় সেই মুণ্ডুটাকে বুক থেকে টেনে ফেলে দিলাম। সে খানিকটা গড়িয়ে পড়ে আবার হাসতে হাসতে আমার বুকের উপর এসে বসল। কী আপদ !

আমি চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম ! সে বলল, "ও কী, চোখ বুজলে কেন ? শোনো যা বলি।" আমি তবু চুপ করে রইলাম। সে কখন আস্তে আস্তে বুক থেকে মুখের কাছে এগিয়ে এসেছে টের পাইনি। হঠাৎ তার গালপাট্টা দাড়িটা আমার গালে ঘসতেই আমি চমকে উঠলাম। সে আদর করে তার সেই গালপাট্টা আমার গালে ঘসতে ঘসতে আমায় বলতে লাগল—"রাগ করছ কেন ভাই ? একবার চোখটা খোলো।"

আমি জবাব দেব কী, তার সেই দাড়ির ঘর্ষণে বোধ হতে লাগল আমার দেহের ভেতরের অস্থি মেদ মাংসগুলোকে একটা মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে কে যেন আগা-পাস্তলা ঝেঁটিয়ে দিচ্ছে ! সর্ব শরীর রি রি করতে লাগল। আমি ঘাড় দিয়ে একটা জোর ঝাঁকানি মেরে সেই মুণ্ডুটাকে মুখের পাশ থেকে সরিয়ে দিলাম। পাছে আবার সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে এই আতঙ্কে লেপ ছেড়ে একেবারে সোজা হয়ে বসলাম। সে একটু মুচকে হাসল।

আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এই বীভৎস মুণ্ডুটার সঙ্গে এতক্ষণ একলা কাটিয়ে ভয় এবং অস্বস্তির প্রথম ধাক্কাটা যেন অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছিল। আমি তার দিকে চেয়ে বিরক্তির স্বরে বলে উঠলাম—"কী

banglabooks.in

চাও তুমি ?”

সে বলল—“এই কথাটা প্রথমেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তা হলে এতক্ষণ ধরে এতখানি ধস্তাধস্তি করতে হত না।”

আমি বললাম—“আমি কী সাধে ধস্তাধস্তি করেছি ? তোমার যে বিকট রূপ !”

সে বলল—“তোমারই বা কী এমন মনোমোহন রূপ ? ওই তো চিমসে চেহারা !”

আমি বললাম—“থাক, এখন আর রূপের সমালোচনায় কাজ নেই। তুমি কী চাও, বলো।”

সে বলল—“আমি কী চাই, তা আবার বলে দিতে হবে ? আমার কী অভাব তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার চোখ নেই ?”

আমি বললাম,—“দেখো, তোমার কী অভাব আছে না আছে তা দেখবার আমার ইচ্ছেও নেই, দরকারও নেই।”

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল— “দেখছ না, আমার ধড় নেই ! মানুষের একটা চোখ কী একটা পা না থাকলে, তার প্রতি তোমাদের কত দয়া হয়, আমার সারা ধড়টাই নেই দেখেও তোমার এতটুকু দয়া হচ্ছে না ?” বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল।

সত্যি বলছি, তার সেই কান্না দেখে আমার কেমন মায়া করতে লাগল। তার যে অমন ভয়ঙ্কর মূর্তি, যা দেখলেই প্রাণ আঁতকে ওঠে, তা দেখে আর তেমন ভয় করতে লাগল না। বরং ইচ্ছে হতে লাগল তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিই। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। আদর দিলে বেড়ালগুলো যেমন গায়ের উপর এসে গা ঘসতে থাকে, তেমনিতর সেই বিকট মুণ্ডুটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পায়ের উপর মুখ থুবড়ি খেয়ে পড়ে তার গালপাট্টাওয়ালা গালটা বুলোতে লাগল। বেচারার সেই আকুতি-কাকুতি দেখে আমি আর তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলাম না ; তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিগগেস করলাম, “কী হয়েছে তোমার বলো তো ?”

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “আমার ধড় চুরি গেছে !”

banglabooks.in

এই চুরির কথা শুনেই হঠাৎ আজকের খুনের কথাটা আমার মনে পড়ল ! আমি বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ একটা ধড় পাওয়া গেছে বটে, তার মুণ্ডু নেই, সে কী তোমারই ধড় নাকি ?"

কথাটা শুনে সে গলাটা উঁচু করে বলে উঠল—"অ্যাঁ ! ধড় পাওয়া গেছে ? কী রকম ? কী রকম ? শুনি !"

আমি আমার লেখা রিপোর্টখানা টেনে নিয়ে তাকে আগাগোড়া ঘটনাটা পড়ে শোনাতে লাগলাম। সে একমনে শুনতে লাগল। শোনা শেষ হলে এক গাল হেসে বলে উঠল—"দূর ? এ তোমার গল্প ! তুমি গল্প লেখো বুঝি ?"

আমি বললাম—"গল্প হবে কেন ? এ সত্যি ঘটনা।"

সে তার চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলল—"কখখনো না। সত্যি ঘটনা এ রকম হতে পারে না। এ তোমার বানানো গল্প !"

আমি তার কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। খুনের ঘটনার উপর রসান দিয়ে আমি যে এতক্ষণ একটা ঘোরালো রিপোর্ট তৈরি করলাম, সেটা কী তাহলে নিতান্ত ছেলেমানুষী গল্প হয়ে উঠল ?

আমি বললাম—"এতো একেবারে সত্যি ঘটনার মতো ! গল্প কোনখানটা দেখলে ?"

সে বলল—"কাটা-মুণ্ডু কী করে চুরি যায়, এই কাটা মুণ্ডু আমি—আমি তা জানি। তুমি কী করে জানবে ? তোমার ও লেখা ঠিক হয়নি—আগাগোড়াই আজগুবি গল্প হয়েছে।"

আমার কেমন ধাঁধা লাগতে লাগল। এতকাল রিপোর্ট লিখে আসছি, কেউ কখনও নিন্দে করেনি, আজ কি একটা আজগুবি গল্প লিখে ফেললাম ? নাঃ, তার কথায় আমার বিশ্বাস হল না। আমি ভাবছি, সে বলল—"ভাবছ কী ? আমার কাছে শুনে যাও, তবে কাটা মুণ্ডুর রিপোর্ট সঠিক লিখতে পারবে।"

আমি হেসে বললাম—"তাহলে সেটা আরও আজগুবি হবে।"

সে বলল—"কেন ?"

আমি বললাম—"এত রাত্রে একটা কাটা মুণ্ডু এসে আমায় রিপোর্ট দিয়ে

banglabooks.in

গেল, একথা শুনলে লোকে বলবে কী ? বলবে গাঁজাখুরি গল্প !"

সে রেগে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল—"কী, আমি গাঁজাখুরি গল্প ? আমি সর্দার গজধর সিংহ, যে এককালে হাতির শুঁড় ধরে চরকিবাজির মতো বিশ মণ হাতি ঘুরিয়েছে, সে হল গল্প ? আর তোমার ওই কাগজে লেখা কতকগুলো ফাঁকা কথা, তাই হবে সত্যি ?"

তার এই ভীষণ রাগ দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। আমি বললাম—"রাগ করো কেন ভাই ? এই দুপুর রাত্রে, কেউ কোথাও নেই, একটা কাটা মুণ্ডু কোথা থেকে আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করছে, এ কথা বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে ? বলবে ও তোমার বানানো গল্প !"

সে ভুরু দুটো কুঁচকে বলল—"বিশ্বাস করবে না কেন ?"

আমি বললাম—"কাটা মুণ্ডু কখনও কথা কইতে পারে ? না সে জ্যান্ত মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে ?"

সে বলল—"পারে কি না পারে—এই তো স্বচক্ষে দেখছ ! বলো, পারে কি না পারে।"—বলে সে আমায় এক ধমক দিয়ে উঠল !

আমি বললাম—"হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখছি বটে যে তুমি এসেছ, কিন্তু—"

সে বলল—"কিন্তু কী ? কিন্তু আবার কী ?—এই তো দেখছ, স্বচক্ষে দেখছ সর্দার গজধর সিংহের কাটা মুণ্ডু তোমার সামনে স্পষ্ট কথা কথা কইছে !"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, দেখছি বটে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সে বলল—"রোসো বুঝিয়ে দিচ্ছি !" বলেই সে তার সেই সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো একবার বার করে দেখাল। মনে হল বুঝিবা আমাকে এখনই কামড়ে ধরবে ! আমি আঁতকে উঠে একটু পিছিয়ে গেলাম।

সে বলল—"এইবার বুঝতে পেরেছ তো ? এখন শোনো আমার ইতিহাস—তারপর তোমার রিপোর্টটা লিখো। কাটা মুণ্ডুর রিপোর্ট কি সোজা জিনিস নাকি !"

এই রে, আবার ইতিহাস যে আরম্ভ করে ! এমনি করে সারা রাত চলবে নাকি ? আমি বললাম—"মাথা ধরেছে আমার ; আমি এখন ইতিহাস শুনতে পারব না।"

banglabooks.in

সে বলল—"শুনতেই হবে তোমাকে ! না শুনলে তোমার কান ফুঁড়ে জোর করে শুনিয়ে দেব।"

আমি আর কী করি ? প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম—"আচ্ছা তা হলে বলো।"

সে আরম্ভ করল—"আমার নাম সর্দার গজধর সিং। আসল নাম কিন্তু পূর্ণ বেহারা। হাতির শুঁড় ধরে ঘোরাতে পারতাম বলে লোকে অমায় খেতাব দিয়েছিল গজধর সিং। কত বছর আগে ঠিক জানি না, আমি ছিলাম বিষ্ণুপুরে বনগাঁয়ের জমিদারের পাইক। যেমন দুশমনের মতো চেহারা, তেমনই দুশমনের মতো গায়ে জোর ! আমার ডাকে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত ! আমি বাবুর বাড়ি পাহারা দিতাম। আমার নাম শুনে বনগাঁয়ের বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে চোর কী ডাকাত আসতে সাহস করত না। আমি রোজই দেউড়িতে পাহারা দিই, একদিন সকালে বাড়িতে মহা হইহই পড়ে গেল গিন্নিমায়ের সিন্দুকে ভেঙে হীরের গয়না চুরি হয়েছে। কর্তা আমায় তলব করলেন, আমি দেউড়িতে পাহারা দিই, অথচ চুরি হল কেমন করে ? চুরির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলমি—আমি সর্দার গজধর সিং হাজির থাকতে, চোর এল কেমন করে ? আমি বললাম—'হুজুর, বাইরে থেকে কখনই চোর আসেনি।' কর্তা বললেন—'তবে কি আকাশ থেকে চোর পড়ল ?' আমি বললাম—'চুরি ভেতরের লোকই করেছে।' কর্তার ছোট ভাই সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে এই কথা শুনে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে উঠল। সে আমার উপর ভারি চটা ছিল। রোজই অনেক রাত্রে লুকিয়ে সে বাড়ি ফিরত বলে আমি তাকে শাসাতাম কর্তাবাবুকে বলে দেব। সেই রাগ তার আমার উপর ছিল। সে বলে উঠল—এত বড় আস্পর্ধা ! চাকর হয়ে মনিবদের চোর বলে—দাও ব্যাটাকে গলাধাক্কা !' বলে সে আমার ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিল। আমি তার হাতখানা তখনই মুচড়ে ভেঙে দিতে পারতাম কিন্তু হাজার হোক মনিব !'

"সেই দিনই চাকরির উপর আমার ঘৃণা হল ! চাকর বলেই তো মিছামিছি অপমানটা সইতে হল ! আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে একটা ডাকাতের দল খুললাম। মনে করলাম গায়ের জোরে যা পারি রোজগার করব, পরের

banglabooks.in

চাকরি আর করব না। ডাকাতি ব্যবসা খুব জোর চলতে লাগল। দলের লোকেরা আমার পুরনো মনিব মস্ত ধনী বলে তাঁর বাড়ি লুট করবার জন্যে প্রায়ই আমাকে জেদাজেদি করত, কিন্তু আমি রাজি হতাম না—একদিন তাদের নুন খেয়েছি তো!

"কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে বনগাঁয়ের বনের মধ্যে আমাদের আড্ডায় অন্ধকারে বসে আছি, এমন সময় দেখি আমাদের দলের এক পাহারাওয়ালা একজন লোককে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসছে। আমি অন্ধকারে লোকটার চেহারা ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কে রে?' পাহারাওয়ালা উত্তর দিল—'সর্দার, এই লোকটা আমাদের আড্ডার কাছে ঘুপটি মেরে বসেছিল, নিশ্চয় পুলিশের চর হবে—তাই বেঁধে নিয়ে এসেছি।' আমি বললাম—'আলো নিয়ে আয়, দেখি লোকটা কে।' আলো আনতে লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি বলে উঠলাম—'প্রণাম হই ছোটবাবু।' ছোটবাবু আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলল—'রক্ষে কর গজধর আমায়।' এই ছোটবাবুই আমায় একদিন গলাধাক্কা দিয়েছিল। আমি তাকে তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে বুকে তুলে নিয়ে বললাম—'কী হয়েছে ছোটবাবু?' ছোটবাবু বলল—'আমায় পুলিশে তাড়া করেছে।' আমি বললাম, 'কেন?'

সে বলল—'সেই হীরের গয়না চুরি নিয়ে। তোকে মিথ্যে বলব না—চুরি আমিই করেছিলাম। পরে ধরা পড়ি। পুলিশের হাজত থেকে পালিয়ে এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। তুই আমাকে আশ্রয় দে।' আমি বললাম—'সে কী ছোটবাবু! এ তো আপনারই আশ্রয়—আমরা আপনার চাকর মাত্র! তবে শুনে রাখুন, যদি আমরা ধরা পড়ি তবে একসঙ্গে মরতে হবে। কেউ যদি আমাদের কাউকে ধরিয়ে দিতে যায়, তার জীবন আমাদের হাতে! আপনি হলেও নিস্তার নেই!'

"ছোটবাবু আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। আমরা যেমন লুকিয়ে ফিরি তার চেয়ে বেশি করে লুকিয়ে তাঁকে ঘুরতে ফিরতে হত—কারণ তিনি দাগী তাঁর নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে। আমরা তাঁকে যকের ধনের মতো আগলে আগলে রাখতাম। এমন কারও সাধ্য ছিল না, তার গায়ে হাত

banglabooks.in

banglabooks.in

দেয়।

"একদিন ছোটবাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন বিষ্ণুপুরে গোটাকতক খুব বড় বড় ডাকাতি হওয়াতে পুলিশ চারিদিকে হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল। আশ-পাশে চারিদিকে তাদের গোয়েন্দা ঘুরছিল। ভয় হল ছোটবাবু পুলিশের হাতে পড়লেন নাকি! খবর পেলাম আমাদের আড্ডার খুব কাছাকাছি পুলিশ ছাউনি ফেলেছে, দলের সবাই সে জায়গা ছেড়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু আমি ছোটবাবুকে ছেড়ে পালাতে পারলাম না—তাঁকে খোঁজবার জন্যে আমাকে দলবল নিয়ে সেইখানে থেকে যেতে হল।

"পরের দিন রাত্রে পুলিশ আমাদের আড্ডা ঘেরাও করল। আমরা ধরা পড়লাম। হাতে হাতকড়া পড়ল। পুলিশের সঙ্গে ছোটবাবু ছিলেন, তাঁর কিন্তু হাত খোলা। তিনি আমাকে সনাক্ত করলেন—'এই গজধর সিং, আমাদের বাড়ির পুরনো পাইক, এখন ডাকাতের সর্দার!'

"আমাদের সকলকার জেল হল—বারো বচ্ছর করে। কিন্তু ছোটবাবুর সকল অপরাধ মার্জনা হল। তিনি নিজের প্রাণের মায়ায় এত বড় একটা ডাকাতের দল ধরিয়ে দিয়ে যে নিমকহারামি করলেন—এ তারই বখশিশ। কিন্তু আমি যে এতদিন তাঁর বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে লুকিয়ে রাখলাম, তার বখশিশ কেউ দিল না।"

এই অবধি বলে সে চুপ করল। তারপর তুড়ুক করে লাফিয়ে একেবারে আমার বুকের উপর এসে সেই কাটা মুণ্ডুটা বলে উঠল—"কী ঘুমোলে নাকি?"

আমি বললাম—"না ঘুমোইনি। কিন্তু তোমার মুণ্ডু চুরির ইতিহাস কই? এতো তোমার জীবন কাহিনী।"

সে বলল—"তুমি তো আচ্ছা বোকা! গোড়া না শুনলে শেষটা বুঝবে কী করে?"

আমি বললাম—"আচ্ছা তা হলে বলো।"

সে আমার বুক থেকে তুড়ুক করে নেমে বলতে লাগল—"বারো বচ্ছর তো জেলে কাটল ভালোয় মন্দয়। ফিরে এসে আর বিষ্ণুপুর বনগাঁয়ের

banglabooks.in

দিকেই গেলাম না। কিন্তু সেখানকার খবর মাঝে মাঝে পেতাম। কিছুদিন বাদে শুনলাম ছোটবাবুকে খুন করেছে আমাদেরই সেই ডাকাতের দলের একজন। জিনিসপত্র টাকাকড়ি কিছুই নেয়নি, শুধুই খুন করেছে। লোকে শুনে অবাক ! কিন্তু যখন ধরা পড়ে কবুল করল তখন লোকে বুঝতে পারল। সে বলেছে ছোটবাবু নিমকহারামি করে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল বলেই তাকে খুন করতে হয়েছে। কারণ মাকালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে সে শপথ করেছিল যে তাদের দলের মধ্যে যে নিকহারামি করবে সে যদি আপনার মায়ের পেটের ভাইও হয় তবুও তার বুকে ছুরি বসাতে কাতর হবে না। মা কালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে শপথ। সে শপথ ভঙ্গ করে সে নরকে যাবে ?

"বেচারা ফাঁসি গেল, তাও শুনলাম। গায়ে মাথায় কতবার কত লাঠি পড়েছে, রক্ত ঢেউ খেলে গেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কখনও এক ফোঁটা জল পড়েনি। কিন্তু সেদিন তার ফাঁসির খবর শুনে আমার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল, কেন কে জানে ?

"আমার বুকটা যেন ভেঙে গেল। আর ডাকাতের দল খুলতে পারলাম না, সে সাহসও ছিল না, শক্তিও ছিল না। এবার একটা চোরের দল গড়লাম। হইহই রইরই করে, মশাল জ্বেলে, পাড়া জাগিয়ে রাজা-জমিদারের বাড়ি ডাকাতি নয়, এবার চুপিচুপি, গাঢাকা দিয়ে, পা টিপে টিপে গৃহস্থের বাড়িতে সিঁধ কেটে চুরি !"

এই অবধি শুনে আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম—"কই হে, মুণ্ডু চুরির ব্যাপারটা কখন আসবে ? এতো তেমার সিঁধেল চুরির গল্প আরম্ভ হল !" যেমন এই কথা বলা, কাটা মুণ্ডুটা একটা উলকার মতো ঘুরতে ঘুরতে আমার মুখের সামনে এসে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল—"দেখো, ফের যদি আমায় বিরক্ত করবে তা হলে এই দাঁত দিয়ে তোমার জিভ কেটে দেব—চিরদিনের জন্যে বকবকানি থেমে যাবে।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—"আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না !"

সে আবার শুরু করল—"চুরির ব্যবসা বেশ সজোরে চলতে লাগল। সম্বলের মধ্যে আমাদের ছিল গোটাকতক সিঁধকাটি আর খানকতক কুড়ুল।

banglabooks.in

কাঠি দিয়ে সিঁধ কাটা হত, আর কুড়ুল দিয়ে সিন্দুক বাক্স এবং দরকার হলে মানুষের মাথা ভাঙা হত। দলে আমরা পাঁচজন ছিলাম—যেন পঞ্চপাণ্ডব ! পাড়াগাঁয়ে দশ ক্রোশ অন্তর থানা পুলিশ। আমাদের খবরদারি করে কে ? চোরে কামারে দেখা হলে তো ? কাজেই আমাদের ব্যবসা বেশ ফলাও হয়ে উঠল—কিন্তু নিয়তি যাবে কোথায় ? এক জায়গায় সিঁধ কাটতে গিয়ে ইঁদুরের মতো জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেলাম। সিঁধ কেটে গর্তের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে পা দুটি চালিয়ে এদিক ওদিক পরখ করে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে যেই কোমর অবধি চালিয়ে দিয়েছি, অমনি ভেতর থেকে দুটো লোহার মুগুরের মতো দুখানা হাত দিয়ে কে আমার কোমরটা সজোরে জাপটে ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। আমি বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু সেই ভীমের সঙ্গে পেরে উঠলাম না। ব্যাপার দেখে অমার সঙ্গীরা বাইরে থেকে আমায় জাপটে ধরে টানতে লাগল। ভেতরে বাইরে দুদিক থেকে আমার দেহটাকে নিয়ে টানাটানি চলতে লাগল—যেন দেবাসুরে মিলে সমুদ্র মন্থন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। শেষে যখন আমায় আর ধরে রাখতে পারা গেল না—আমার কাঁধ অবধি প্রায় গর্তের মধ্যে চলে গেছে তখন আমাদের দলের মধ্যে ঠিক অসুরের মতো যার চেহারা সে আর বাক্যব্যয় না করে তার হাতের কুড়ুলটা নিজের মাথা অবধি তুলে একটি কোপ দিয়ে ধড় থেকে আমার মুণ্ডুটা সাফ দিল খসিয়ে। তারপর আমার কাটা মুণ্ডু নিয়ে লাফাতে লাফাতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

আমি বলে উঠলাম—"কেন ! কেন ! কাটা মুণ্ডু নিয়ে পালাল কেন !"

সে বলল—"তা আর বুঝলে না ! মুণ্ডু সুদ্ধ ধরা পড়লে লোকে আমায় চিনে ফেলত। শুধু ধড় দেখে তো মানুষ চেনা যায় না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তা হলে আজকের মুণ্ডু চুরিটাও কী ওই ব্যাপার ?"

সে বলল—"রোসো। আগে বলো দেখি সিঁধ কাটা হয়েছে কি না ?"

আমি বললাম—"কই সিঁধ কাটা তো দেখিনি।"

সে ভুরু দুটো কুঁচকে বলল—"তবেই তো মুশকিলে ফেললে ! সিঁধ কাটা

banglabooks.in

নেই—চোরকে নিয়ে টানাটানি নেই, খামকা মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে গেল? ব্যাটারা এমন বেদস্তর কাজ করল! পাজি ব্যাটারা, ছুঁচো ব্যাটারা, গর্দভ ব্যাটারা, এমন বেদস্তর কাজ করল!" বলে সে রাগে গমগম করতে লাগল।

আমি একটু ভেবে বললাম—"দেখো, ও ঠিক হয়েছে। তোমার ইতিহাস শুনে আমি একটা হদিস পেয়েছি। টাকা কড়ি চুরি যায়নি অথচ একটা খুন হয়েছে এবং তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না এর একটা হদিস তোমার ছোটবাবুর খুন আর তোমার মুণ্ডু কাটার গল্প থেকে আমি বেশ ধরে নিয়েছি। এবার আমি লিখে দিতে পারব।"

সে এক গাল হেসে বলল—"তাহলে আমার বখশিশ!"

আমিও হেসে বললাম—"কী বখশিশ চাও?"

সে বলল—"আমায় একটা ধড় দাও। আমি কি শুধু মুণ্ডুটা নিয়ে ঘুরে বেড়াব!"

আমি বললাম—"ধড় কোথায় পাব?"

সে ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে উঠে বলল—"কি রাস্কেল! এতক্ষণ পরে বলল ধড় কোথায় পাব? সাতকাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্যা! আমি কি তোমার ঘরে যাত্রা শুনতে এসেছি? ধড় আমার চাই!" বলে সে দমদম করে আমার টেবিলের উপর তার কপালটা ঠুকতে লাগল।

আমি বললাম—"করো কী! করো কী!"

সে বলল—"বলো একটা ধড় এনে দেবে? নইলে এই আমি মাথা ঠুকতে লাগলাম।" বলে আবার দমাদ্দম মাথা ঠুকতে লাগল।

আমি তার এই ব্যাপার দেখে বলে উঠলাম—"থামো, থামো। আমি তোমার জন্যে নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখব।"

সে বলল—"আচ্ছা তাহলে এই কথাই রইল। আমি আবার একদিন আসব, মনে থাকে যেন"—বলেই সেই কাটা মুণ্ডুটা শূন্যের উপর ডিগবাজি খেতে খেতে উঠে গিয়ে কড়িকাঠের কাছে ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে গেল। আমি ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম।

সকালবেলা খুনের খবরটা বেশ বাগিয়ে গুছিয়ে লিখে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু সম্পাদক ছাপালেন না। বললেন, অচল। সেই জন্যে

banglabooks.in

রাগ করে সেটাতে আরও খানিকটা রসান দিয়ে 'কায়াহীনের কাহিনী'র পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই পাঠিয়ে দিচ্ছি, জানি সেখানে অচল হবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই, সত্যই ওই দেহহীন ভদ্রব্যক্তিটি আবার কোনও দিন নিশীথ রাত্রে নিদ্রাচ্ছন্ন আমাকে দেখা দিতে আসবেন নাকি ? কে জানে !

banglabooks.in

খোট্টাই শরবত

হাতের লেখা খারাপ, নিজের লেখা দেখে নিজেরই লজ্জা হয়। সেই লজ্জা নিবারণের জন্যই একটা বাংলা টাইপরাইটার কিনেছিলাম।

হাতের কাছে গুডফ্রাইডের ছুটি পেয়ে পুরীতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ইচ্ছে ছিল একটা বড় গল্প ওইখানেই আরম্ভ করব, আর ওইখান থেকেই একেবারে ছাপতে দেব। কাজেই সঙ্গে টাইপরাইটারটাও নিতে হয়েছিল।

বেশ সুন্দর টাইপরাইটার, বেশ স্পষ্ট হরফ। সেই মুক্তোর মতো বাংলা হরফগুলি দেখে আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠত! আমি কয়েকদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রোজই তার হরফগুলো কাগজের উপর তুলে, লাইনের পর লাইনের মালা গেঁথে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আর তন্ময় হয়ে যেতাম। এমনই আমার নেশা চেপেছিল যে অনবরত ঠুকে ঠুকে কলটাকে প্রায় বিগড়ে তোলবার জো করেছিলাম।

পুরীর সমুদ্র থেকে একটু দূরে আমার এক বন্ধুর একটি ছোট্ট বাড়ি আছে। আমি পুরীতে গেলেই সেইখানে আড্ডা গাড়ি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাড়িখানি অনেক দিনের পুরনো কিন্তু বন্ধুবর সেখানিকে মেজে-

banglabooks.in

ঘসে বেশ ঝকঝকে করে রেখেছেন। বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এক উড়ে চাকর। বন্ধুবরের অতিথিরা কেউ গেলে সে-ই ঘর-দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে। এ ছাড়া বাড়িতে আর কেউ লোক থাকে না।

বন্ধুবর এই বাড়ি কাউকে ভাড়া দেন না। তিনি নিজেও খুব অল্পই সেখানে গিয়ে থাকেন, এবং আমার মতো দুটি একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু অবরে সবরে সেই বাড়িতে প্রবেশ করবার অধিকার পায়। কাজেই বাড়িখানা প্রায় সব সময় বন্ধ হয়েই থাকে। বোধ হয় এই জন্যেই আশপাশের লোকেরা বাড়িখানাকে পোড়ো-বাড়ি বলে। আগে ভাড়া নেবার জন্যে অনেক খোঁজ আসত, কিন্তু এখন কেউ আর খোঁজও করে না—বলে ওটা হানাবাড়ি।

আমি অনেকবার এ বাড়িতে এসেছি। কিন্তু বাড়িখানা যে হানা তার কোনও পরিচয় কখনও পাইনি। কিন্তু অনেকে নাকি পেয়েছে তার গল্প মাঝে মাঝে আমার কানে আসত। আশপাশের অভ্যাগতরা আমাকে সকালবেলা সেই বাড়ি থেকে বেরতে দেখে প্রায়ই খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন—"হ্যাঁ মশাই কিছু দেখলেন কি ?" আমি বলতাম—"কই না, এমন আশ্চর্য কিছুই তো দেখিনি।" তাঁরা আমার উত্তরে হতাশ হয়ে আড়ালে পরস্পর বলাবলি করতেন—"খেস্টান যে ! ওরা কী ওসব দেখতে পায় !" আমি খ্রিস্টান হলাম কী করে বুঝতে পারতাম না। বোধ হয় বাড়িতে মাঝে মাঝে মুর্গির যে সব পালক উড়ত তারাই ওই খবর রটিয়েছে।

বাড়িতে তিনখানি মাত্র ঘর। আমি দুখানি ব্যবহার করতাম। একখানি একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বন্ধ থাকত। কোথাও এমন ফাঁক ছিল না যে দেখা যায় তার মধ্যে কী আছে। উড়ে চাকরটার মুখে শুনেছি সে ঘর কখনও খোলা হয় না, তার চাবিও তার কাছে থাকে না, এবং তার মধ্যে যে কী আছে তাও সে জানে না।

বাড়িটাকে নয়, এই ঘরটাকে কেমন আমার হানা বলে মনে হত। বাড়িটার আর দুখানি ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চুনকাম করা কিন্তু এই ঘরটার সামনে দাঁড়ালে বেশ বোঝা যেত যে অনেকদিন থেকে এর গায়ে সংস্কারের হাত পড়েনি। নোনা লেগে এর গায়ের বালি জায়গায় জায়গায় একেবারে খসে পড়ে ভেতরের ইটগুলি জরজর হয়ে উঠেছে। দেখলে ঠিক মনে হত

banglabooks.in

যেন কোনও একটা ভীষণ জন্তু তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে এর গায়ের মাংস স্থানে স্থানে খুবলে নিয়েছে, সেখানকার ঘা গুলো দগদগ করছে। রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ এই লাল লাল ক্ষতগুলোর দিকে চোখ পড়লে সর্বাঙ্গ কেমন চমকে উঠত। এই ঘরখানার এমন দুর্দশা কেন, বুঝতে পারতাম না। বন্ধুবরকেও কোনওদিন জিজ্ঞেস করতে পারিনি—কেমন একটা সংকোচ হত—মনে হত যে এর সঙ্গে যে কথা জড়িত আছে, তা যেন চাপা থাকাই ভালো।

সকালবেলা পুরী পৌঁছে, টাইপরাইটার প্রভৃতি জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে, আহারাদি সেরে সারাদিনটা ঘুমিয়েই কাটানো গেল। কারণ গত রাত্রে গাড়ির ভিড়ে মোটেই ঘুম হয়নি। বিকেলে টাইপরাইটারে খানিকক্ষণ হাতটা সড়গড় করে নিয়ে, সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে এসে রাত্রে গল্প লেখা আরম্ভ করা যাবে ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ইকমিক কুকার ছিল, তাতে ডাল চাল আর দুটো ডিম চাপিয়ে দিয়েছিলাম। ও আপনিই তৈরি হয়ে থাকবে, ইচ্ছে মতো খাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য বিদেশে চাকর বামুন নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই—নিজের সব কাজ আমায় নিজেকেই চালিয়ে নিতে হয়।

সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় বিনোদের সঙ্গে দেখা। সে মাসখানেক হল সপরিবারে পুরীতে এসে বাস করছে। বিনোদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অনেকদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, তারপর অনেকদিন ছাড়াছাড়ি। সে এখন বিহারের কোন জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি করে। বিনোদ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আমরও খুব আনন্দ হল। দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বিনোদ বলল—"তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি গিয়ে এখন কী করবি? আমার বাড়ি চল, দুই বন্ধুতে খানিকটা গল্প করা যাবে।" অনেকদিন পরে দেখা, বন্ধুর অনুরোধ, তার উপর তার সঙ্গ আমারও ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না, কাজেই বিনোদের বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম। গল্প লেখার আশা কিছুক্ষণের জন্য বিসর্জন দিতে হল। টাইপরাইটারটার গায়ে হাত বুলানোও আজ হবে না দেখছি। বিনোদের বাড়ি পৌঁছে দেখি একটা মহাভোজের

banglabooks.in

আয়োজন লেগে গেছে— বাড়ির ছেলেরা গুডফ্রাইডের উৎসবকে কালিয়া পোলাওর গন্ধে আমোদিত করে তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বিনোদ বলল—"তাহলে তুই খেয়ে যা—অনেকদিন একসঙ্গে বসে দুই বন্ধুতে খাইনি !" আমি বললাম—"বেশ !" ইকমিক কুকারে চড়ানো আমার ডাল ভাতটা নষ্ট হবার কথা একবার মনে পড়ল কিন্তু তাদের বড়লোক জ্ঞাতিদের সামনে সেই তুচ্ছ কথাটা আর তুলতে পারলাম না। খানিক বাদে বিনোদের চাকর দুই গ্লাস শরবত নিয়ে এসে হাজির। বিনোদ গ্লাসটা হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে বলল—"পশ্চিমে থাকি বলে এই খোট্টাই শরবত খাওয়াটা আমার কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে—সন্ধ্যাবেলা এক গ্লাস না হলে চলে না। তুইও খেয়ে দেখ শরীরটা বেশ ভালো বোধ করবে !" কী সুমিষ্ট সুগন্ধ শরবত—আমি প্রায় এক চুমুকেই গ্লাসটা শেষ করে ফেললাম। বিনোদ বলল—"কেমন খেতে লাগল ?" আমি বললাম—"চমৎকার !" সে বলল—"খানিক বাদে আরও চমৎকার বোধ হবে, বেশ খিদে পাবে—শরীরে বেশ স্ফুর্তি বোধ হবে। চমৎকার দাওয়াই।"

দুই বন্ধুতে বসে নানা সুখ দুঃখের গল্প চলতে লাগল। বিনোদের চাকর এসে আলবোলাতে অম্বুরি তামাক দিয়ে গেল। আমার তামাক খাওয়া অভ্যাস নেই ; বিনোদ বারবার করে বলতে লাগল—"টেনে দেখ হে, বেশ লাগবে ! কোনও ভয় নেই !" তার পীড়াপীড়িতে নলটা তুলে নিয়ে ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানতে শুরু করে দিলাম। প্রথমটা দু একবার একটু কাশি এল, তারপর কিন্তু টানতে টানতে বেশ মিঠে লাগতে লাগল। তামাক টেনে চলেছি, গল্পের স্রোতও চলছে—ছেলেবেলাকার এক কথা একশোবার বলেও যেন আশ মিটছে না ! কেবলই মনে হচ্ছে আজ যেন কী আনন্দের দিন ! কী আনন্দের দিন ! বিনোদের এক একটা কথাতে কখনও মনটা দুলে দুলে উঠছে, কখনও আবার হো হো করে হেসে উঠছি। বিনোদের সব কথাই ভালো লাগছে, সব কিছুতেই স্ফুর্তি হচ্ছে ! বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা কিনা ! বিনোদ বলল—"খিদে বোধ করছিস কি ? কিছু খাবি ?" বিনোদের প্রশ্নে হঠাৎ পেটের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম খিদেটা বেশ চনচনে হয়ে উঠেছে। আমি বললাম—"এত শিগগির কী আর খাবার তৈরি হয়েছে ?" বিনোদ

banglabooks.in

বলল—"খাবারের এখন ঢের দেরি, তুই ততক্ষণ কিছু জলযোগ করে নে।" এই বলে সে বাড়ির ভেতরের দিকে চলে গেল। তার পর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে একটা থালায় একগাদা কচুরি ও রসগোল্লা এনে হাজির করল। আমি সেই খাবারের ডাঁই দেখে বলে উঠলাম—"আমি কি রাক্ষস নাকি হে! এত খেলে রাত্রে আর খেতে পারব কেন?" বিনোদ বলল—"যা পারিস খান্না।" বলে সে থালা থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল—"এমনি করে মেসের বাসায় এক থালা থেকে দুজনে কাড়াকাড়ি করে কতদিন খেয়েছি মনে পড়ে?" আমি বললাম—"খুব মনে পড়ে! সে সব আনন্দের দিন কি আর ভোলবার হে।"

কচুরি আর রসগোল্লা মনে হতে লাগল যেন অমৃত! অনেক রসগোল্লা খেয়েছি কিন্তু এমনতর জীবনে কখনও খাইনি। যতই খাই, ততই মনে হয় আর একটা খাই। দেখতে দেখতে সেই রসগোল্লার ডাঁই শেষ হয়ে গেল, আমার নিজের খাওয়া দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। তবু যেন মনে হতে লাগল, যেমন পেটের খিদে ঠিক তেমনই আছে—একি ভেল্কি নাকি! বিনোদ বলল—"আজ ভারি একটা মজা হয়েছে"—আমি হো হো করে হেসে উঠে বললাম—"তাই নাকি!" মজা এই কথাটা শুনেই আমার যতগুলো মজার কথা জানা ছিল যেন সবগুলো এক সঙ্গে মনে পড়ে কেবলই হাসি পেতে লাগল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে বলল—"আঃ, শোননা মজার কথাটা।" আবার ওই মজা! শুনেই আমার পেট থেকে খিলখিল করে হাসি বেরিয়ে আসতে লাগল—বিনোদের মজার কথাটা যে কী তা আর শোনা হল না। বিনোদ আমার হাসির ছটা দেখে শেষে নিজেই হাসতে শুরু করে দিলে। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে খুব খানিক হেসে যখন থামলাম, ছাঁৎ করে কে যেন মনে করিয়ে দিল তখন—একী ব্যাপার! এত হাসছি কেন?

রাত অনেকখানি এগিয়ে চলে গেল—খিদেটাও খুব প্রচণ্ড বোধ হতে লাগল, কিন্তু তখনও খাবার আসে না। মনটা একবার খুঁতখুঁত করে উঠল—গল্প লেখাটা আজ আর আরম্ভ হয় না দেখছি! তারপরই মনে হল গল্পটা কী? কী তার প্লট? দেখলাম প্লটটা একেবারেই ভুলে গেছি—কে যেন মাথা থেকে একেবারে চেঁচে বার করে নিয়ে গেছে। সেটাকে খুঁজে বার করতে

banglabooks.in

গিয়ে বিড়বিড় করে অনেকগুলো নতুন প্লট চোখের সামনে বেরিয়ে এল। তার মধ্যে কোনটা আমার এবারকার গল্পের প্লট তাই খুঁজে খুঁজে ঠিক করছি এমন সময় বিনোদ আমার পিঠে একটা থাবড়া মেরে বলে উঠল—"কীরে হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?" আমি চমকে উঠে বললাম, "না, গম্ভীর হব কেন?" সে বলল—"নেশা হয়েছে বুঝি?" আমি বললাম—"নেশা কীসের?" "ওই যে শরবতের।" বলতে বলতে মাথাটা কেমন যেন বোঁ করে একবার ঘুরে গেল! বিনোদ বলল—"শরবতে একটু সিদ্ধি ছিল রে।"

কথাটা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল। বোধ হল যেন একটু নেশা হয়েছে। আমি কখনও সিদ্ধি খাইনি—সিদ্ধির নেশা কী রকম তাও জানি না, এই কি সিদ্ধির নেশা? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যেমন মানুষ ঠিক তেমনই তো আছি; ঠিক ঠিক কথা বলছি। তবে আবার নেশা কোথা থেকে হল? এইসব কথা ভাবছি, বিনোদ বলে উঠল—"তুই বড্ড গম্ভীর হয়ে উঠছিস, নিশ্চয় তোর নেশা হয়েছে; কী ভাবছিস বলতো?" আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম—"দূর ভাবনা আবার কীসের।" বললাম বটে কিন্তু সত্যি নানারকমের আবোলতাবোল ভাবনা মাথার ভেতর ক্রমাগতই আসতে লাগল। বিনোদ বলল—"তবে বুঝি তোর খিদে পেয়েছে।" আমি বললাম—"তা ভাই পেয়েছে।" বিনোদ বলল—"রোস খাবার জায়গা করতে বলি।" বলে সে উঠে গেল। আমি একলা বসে রইলাম। বসে বসে ভাবছি, হঠাৎ মনে হল বিনোদ তো অনেকক্ষণ গেছে, বোধ হয় ঘণ্টা দুই হবে, এখনও ফিরল না কেন? তবে কি আমায় খাবার দিতে ভুলে গেল? ওরা কি বাড়িসুদ্ধ সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? তা হলে এখন উপায়? আমি তবুও বসে বসে বিনোদের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বিনোদ ফিরে এল না। বসে বসে দেখতে লাগলাম ঘরে যে আলো জ্বলছে তার প্রদীপের তেল একটু একটু করে কমে আসছে, ক্রমেই আলো মিটমিটে হয়ে আসতে লাগল—এই নিভে যায় যায়! নিভে গেলেই তো একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। সর্বনাশ! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, আকাশে একটুও আলো নেই—বোধ হয় মেঘ করেছে। না, মেঘই তো করেছে!

banglabooks.in

বিনোধ ধাঁ করে এসে বলল—"চল খাবার তৈরি !" খাবারের জায়গায় গিয়ে বসলাম। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—নানা জাতীয় খাবার প্রস্তুত। দেখে জিভে জল আসতে লাগল। তার সুগন্ধটা নাকের ভেতর দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে পাকস্থলীকে নানা ভঙ্গিতে নাচিয়ে তুলতে লাগল। বিনোদ বলল—"খিদেটা কেমন বোধ করছিস ?" আমি বললাম—"খুব !" সে বলল—"দেখলি খোট্টাই শরবতের গুণ !"

সত্যি বটে, এত রাক্ষুসে খিদে কখনও বোধ করিনি।

এক মনে খেয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হল চোরে যদি নতুন টাইপরাইটারটা চুরি করে নিয়ে যায় ? বাড়িতে তো কেউ নেই। একটা সামান্য তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসেছি, সে তালা ভাঙতে কতক্ষণ ! এই কথাটা মনে হতেই মাথার ভেতরের রক্তটা চনচন করে উঠল। অনেক সাধের এই টাইপরাইটারটি আমার। অনেক কষ্টে সংগ্রহ, তাকে বড় ভালোবাসি আমি ! শেষে সেটা চুরি যাবে ? এই কথাটা মনে হতেই আহারের সমস্ত স্বাদ যেন একেবারে চলে গেল। বিনোদ বলল—"কীরে হাত গুটিয়ে বসলি কেন ?" আমি আবার খেতে শুরু করলাম বটে, কিন্তু তেমন উৎসাহ আর রইল না। ঘুরে ফিরে কেবলই টাইপরাইটার জন্যে উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে জাগতে লাগল।

মনে হতে লাগল বিনোদের খাওয়ার পালা যেন আর ইহজন্মে শেষ হবে না ! এখনও গেলে বোধ হয় টাইপরাইটারটাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু বিনোদ স্টুপিড কি তা হতে দেবে ? সে খাবারের পর খাবারই আনছে, আর খাবারগুলো চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছেই—যেন আর গিলতেই পারে না। খেতে আমার আর মোটেই রুচি হচ্ছিল না। আমি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললাম—"আমার উদরে আর তিল ধারণের স্থান নেই ভাই !" বিনোদ তবুও "খা খা" করে আরও একটু খাওয়ালে। শেষে আমার পীড়াপীড়িতে খাওয়া শেষ করে বিনোদ যখন বলল—"আর এক ছিল্লিম তামাক খেয়ে যা"—আমি আর সে কথায় কর্ণপাত না করে বাড়ি থেকে হনহন করে বেরিয়ে পড়লাম। টাইপরাইটারের জন্যে আমার মন ভারি ছটফট করছিল। একটু অগ্রসর হতেই দেখি একটা লোক একটা লণ্ঠন হাতে করে পিছন থেকে ছুটে এল। অন্ধকার রাত্রি দেখে আমার জন্যে বিনোদ আলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

banglabooks.in

কালো কালির মতো অন্ধকার রাত্রি—লণ্ঠনের আলোয় হাত দুই মাত্র জায়গা একটু একটু দেখা যায়, আর বাকি সমস্ত পৃথিবীটা মিশ অন্ধকারে ডুবে আছে। মনে হতে লাগল যেন সেই অন্ধকার সমুদ্র পেরিয়ে তবে বাড়ি পৌঁছতে পারব। চলেছি তো চলেছি। অনেকখানি চলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মনে হল এখনও বাড়ি পৌঁছলাম না কেন ? বিনোদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এক রশি পথও তো নয়। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম—"হাঁরে পথ হারালাম নাকি ?" সে বলল—"না বাবু এইতো সোজা পথ ; হারাব কেন ?" আবার চলতে লাগলাম—কতদূর চলে গেলাম—পা দুটো যেন ভেঙে পড়তে লাগল, তবুও বাড়ি পৌঁছলাম না। একী হল ? এইটুকু পথ আজ এতখানি হয়ে গেল কেমন করে ? ভেবে যেন কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করতেও কেমন লজ্জা হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল আজ সারারাত হেঁটেও বুঝি বাড়ি পৌঁছতে পারব না। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেমন এই কথা মনে হওয়া অমনি চক্ষের নিমেষে কে যেন আমাকে সটান তুলে নিয়ে সোঁ সোঁ করে আকাশপথে উঠতে লাগল। কত উঁচুতে যে তুলে নিয়ে গেল তা বলতে পারি না। যেখানে নক্ষত্রগুলো আছে বোধ হয় ততটা উঁচুতেই হবে। তারপর ওই অতটা উঁচু থেকে আমায় টুপ করে ফেলে দিল। আমি ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়তে লাগলাম। যেমন মাটিতে এসে পা দিয়েছি অমনি বিনোদের চাকরটা লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে বলে উঠল—"এই যে বাবু আপনার বাড়ি।" চেয়ে দেখি সত্যিই তো বাড়ি।

আমি বাড়ি পেয়ে যেন বর্তে গেলাম। তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বিনোদের চাকরটা চলে গেল। অতখানি উঁচু থেকে পড়াতে আমার মাথাটা তখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমি চোখে কানে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেইজন্যে রোয়াকে ওঠবার সিঁড়িটা কোথায় যে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ খুঁজে পেলাম না। তারপর হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বার করে রোয়াকে উঠলাম। এই রোয়াকে উঠে প্রথমেই সেই হানাঘরটা, যাতে দিনরাত চাবি বন্ধ থাকে, সেইটে সামনে পড়ে। আমি তার কাছে আসতেই মনে হল দরজা যেন এতক্ষণ খোলা ছিল, আমি আসতে খুট করে কে বন্ধ করে

banglabooks.in

banglabooks.in

দিল ! বুকের ভেতরটা যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধক করে উঠল। আমি দরজার গায়ে হাত দিয়ে আস্ত আস্তে একবার ঠেললাম—দরজাটা ফুস করে খুলে গেল। একী ব্যাপার ? যে দরজা আজ দশ বচ্ছর খোলা হয়নি, যাকে কেউ কখনও খুলতে দেখেনি, সেটা আজ হঠাৎ এভাবে খুলে গেল কেমন করে ? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করব কি না। গাটা কেমন ছমছম করতে লাগল। পকেট হাতড়ে দেখলাম একটা দেশলাই নেই যে আলো জ্বালি। অন্ধকারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে লাগলাম। ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—সব জিনিসগুলো শুধু আবছায়ার মতো বোধ হচ্ছিল।

এই চিরদিনের বন্ধ ঘরের ভেতর না জানি কী অদ্ভুত জিনিস আছে, তাই দেখবার জন্যে ভারি একটা কৌতূহল হচ্ছিল। অথচ ঢুকতে কেমন ভয়ও করছিল, কাজেই যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চোখে অনেকখানি সয়ে এল। তখন ঘরের ভেতরের জিনিসগুলো একটু একটু স্পষ্ট হয়ে দেখা যেতে লাগল। ঘরের একধারে একখানি ছোট্ট খাটিয়া—তাতে চাদর, বালিশ দিয়ে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানার উপর কেউ শুয়ে আছে কি না ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। একবার মনে হল কে যেন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল। একটা কোণে একটা তোরঙ্গ রয়েছে, তার গায়ে একখানা সাদা টিকিট মারা। তার পাশেই একটা আলনা, তার গায়ে কাপড়, চাদর, তোয়ালে, গামছা ঝুলছে—একটা আঁকড়িতে একটা ছাতা ও একটা লাঠি, নিচে এক জোড়া চটি জুতো। একটু দূরে একটা কুঁজো, তার মুখে একটা গ্লাস চাপা। আরও টুকরো টাকরা কী সব জিনিস রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ঘরের ভেতরটা দেখে মনে হল, নিশ্চয় এখানে কেউ বাস করে। নইলে দশ বচ্ছর যে ঘর দিনরাত বন্ধ থাকে সে ঘর লোকের প্রতিদিনের ব্যবহার্য এই সব জিনিস দিয়ে এমন পরিপাটি করে সাজানো হবে কেমন করে ? কিন্তু কে বাস করে ? সে গেলই বা কোথায় ? এর চাবিই বা সে পেল কেমন করে ? আজ দিনের বেলায় তো এ ঘর দেখেছি তাতে তো একবারও মনে

banglabooks.in

হয়নি এর মধ্যে কোনও জ্যান্ত মানুষ আছে বা থাকতে পারে ? এ ঘরের চেহারা দেখলে বোধ হয় যেন এ একেবারে গালা মোহর করা ঘর। তবে এর মধ্যে মানুষ ঢুকলো কেমন করে ? এ কী ভৌতিক কাণ্ড।

এই বাড়ির সম্বন্ধে আশপাশ থেকে যত ভুতুড়ে গল্প শুনেছিলাম, সব একে-একে মনে পড়ে বুকটা কেমন দুরদুর করতে লাগল। মনে হতে লাগল, চোখের সামনে বোধ হয় এখনই একটা বিকট আকৃতির পুরুষ দেখতে পাব। কিংবা ধবধবে সাদা কাপড় পরা এতখানি ঘোমটা দেওয়া একটা মেয়ে ছায়ার মতো পাশ দিয়ে চলে যাবে। হয়তো কারা এখনই বিকট অট্টহাসি হেসে উঠবে, নয়ত খোনা-গলাতে কেউ বলতে থাকবে আমাকে—"এখানে কী কঁরতে এঁসেছিস ? দূঁর হঁ। বেঁরোঁ।"

কিন্তু ভয় পাওয়া নয় ! ভয় পেলেই ভূতের ভয় আরও চেপে বসে ! সেই জন্যে বুকে সাহস নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তবু পা দুটো আমার কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎ কেমন একটা শিরশিরে বাতাস এসে গায়ে লাগল, তারপর দেখি একটা বিশ্রী কিঁ-ই-চ শব্দ করে দরজাটা কে বন্ধ করে দিল। সে কে রে বাপু ? অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও সাড়া পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটাকে ঠেলে আবার খুলে দিলাম। ঘর যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। দরজা যে বন্ধ করেছিল, তাকে কই দেখতে পেলাম না। ভূতই হোক, মানুষই হোক, নিশ্চয় কেউ ঘরের মধ্যে আছে, নইলে দরজা বন্ধ করে কে ? আমি একটু গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম—ওই কোণের দিকটায় কাউকে দেখা যায় কিনা, কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু চোখে পড়ল আমার টাইপরাইটারটা। একটা টেবিলের উপর সেটা বসানো রয়েছে। আমাকে দেখে সেই অন্ধকারে তার ধবধবে সাদা দাঁতগুলো হাসিতে ঝকঝক করে উঠল। মনে হল বেচারা যেন কী একটা সঙিন বিপদে পড়েছিল, আমায় দেখে বাঁচল।

তখনই আমি বুঝতে পারলাম, এ ভূত নয়, ভেলকি নয়—এ চোরের কাণ্ড ! আমি গোড়াতে যা ভয় করেছিলাম, এ তাই। চোর ব্যাটা টাইপরাইটার চুরি করে পালাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি এইখানে

banglabooks.in

রেখে হয় পালিয়েছে, নয় লুকিয়েছে। আমি জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠলাম—"কে ঘরের ভেতর লুকিয়ে আছিস, এখনই বেরিয়ে আয়। নইলে আমি খুন করব—খুন করব।"

আমি অনেক চেঁচালাম, কিন্তু কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল না। আমার হাতে খুন হবার জন্যে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রইল। তবে করি কী? কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। একবার ভাবলাম নিজের ঘর থেকে একটা আলো জ্বেলে নিয়ে আসি, কিন্তু তখনই মনে হল সেই ফাঁকে চোর যদি টাইপরাইটারটা নিয়ে পালায়। টাইপরাইটারকে বাঁচাতেই হবে। আমি আচ্ছা করে মালকোঁচা এঁটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মনে হল গায়ের কাছ দিয়ে হাওয়ার মতো কী একটা সরে গেল। যাক চোরটা তা হলে চুপিচুপি পালিয়েছে। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি ধুঁকতে-ধুঁকতে খাটিয়ার উপর গিয়ে বসে পড়লাম।

খাটিয়ার ওপাশে ছোট্ট একটা টেবিল—তার উপর টাইপরাইটারটা বসানো, তার সামনে একখানি ছোট্ট টুল। আমি সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। যাক, টাইপরাইটারটা তাহলে বাঁচল।

শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হচ্ছিল। খাটিয়ার উপর নরম বিছানা পেয়ে মনে হচ্ছিল এইখানেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু কার এ বিছানা কে জানে? সে হয়তো শেষ রাত্রে ফিরে এসে আমায় চ্যাংদোলা করে তুলে কোথায় ছুড়ে ফেলে দেবে। তা দিক গে। আর এখান থেকে উঠতে পারি না। সর্বশরীর ঝিমিয়ে আসছে। খট খট খট খট! খট খট খট! খট খট! টুং! আমি ধড়মড় করে সোজা হয়ে গেলাম। খট খট খট! খট খট খট! একী, টাইপরাইটার আপনি-আপনি এরকম হরফ লিখে চলেছে কী রকম? তাকে ভূতে পেল নাকি? আমি চোখ দুটো বড় করে টাইপরাইটারের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছি, হঠাৎ নজরে পড়ল, টাইপরাইটারের সামনে টুলের উপর কে যেন বসে রয়েছে। ঠিক মানুষ নয়, ছায়াও নয়, ছবিও নয়, তাকে দেখাও যাচ্ছে না, তবু স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে বসে রয়েছে টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে টুলের উপর। এত বড় সাদা দাড়ি বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, বেশ বড় বড় উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ, দু জোড়া খুব

banglabooks.in

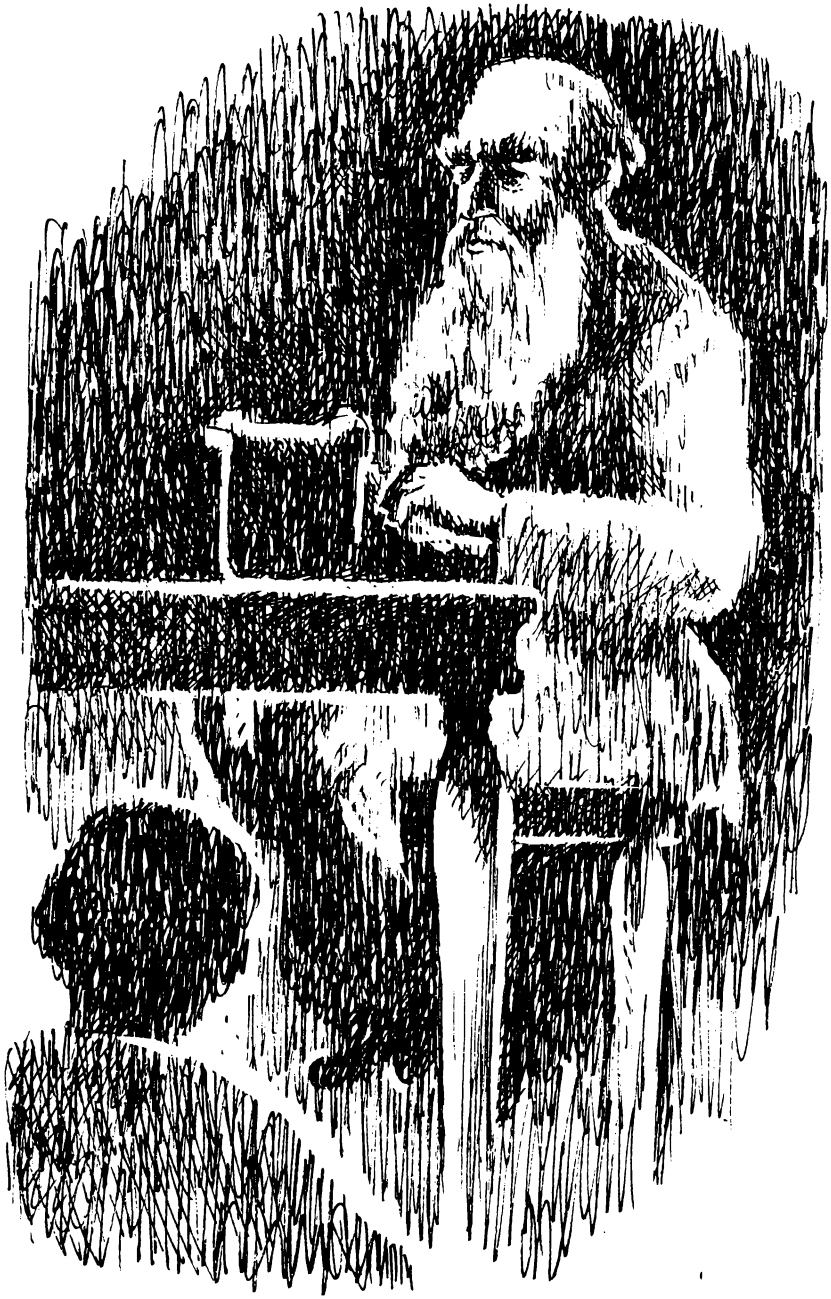

banglabooks.in

ঘন ভুরু—একেবারে সাদা হয়ে গেছে। খুব প্রশস্ত কপাল, তা থেকে একটি শ্বেত পাথরের স্নিগ্ধ সাদা আভা যেন বেরিয়ে আসছে। দেখলে ভক্তি হয়। আমি কথা কইবার চেষ্ট করলাম, পারলাম না। মনে মনে প্রশ্ন করলাম—"কে আপনি ?" সেই বুড়োর হাত চলল আর টাইপরাইটারটা বলে উঠল—"খট-খট-খট-খট !" আমি আবার বললাম—"কে আপনি ?"

বুড়োর হাতের টিপনিতে এবার আরও জোরে টাইপরাইটার শব্দ করে উঠল—"খট-খট-খট-খট !"

মানুষ যেমন টাইপরাইটারের হরফ দেখে লেখা পড়তে পারে, সেই অন্ধকারে শুধু তার শব্দ শুনে হঠাৎ আমি তার লেখা বেশ বুঝতে পারলাম। চোখ বুজে হরফ না দেখে টাইপরাইটারে আমি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতাম। এখন বোধ হল না দেখে শুধু শব্দ শুনে পড়তেও পারি।

আমার প্রশ্নে টাইপরাইটারের মারফৎ বৃদ্ধ জবাব দিলেন—"আমি ব্যোপদেব।"

আমি বললাম—"ও, যিনি ব্যাকরণ লিখেছেন, সেই ব্যোপদেব আপনি ?"

"খট-খট-খট-খট !—না, না, না !"

"তবে আবার কোন ব্যোপদেব ?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ব্যোপদেবকে চেন না ?—যিনি গল্প লেখকদের আদিম পুরষ !"

আমি বললাম—"ব্যোপদেব ঠাকুর কী গল্প লিখেছেন ?"

"তুমি কথাসরিৎসাগরের নাম শুনেছ ? সে ব্যোপদেবেরই লেখা।"

আমি বললাম—"সে কী মশাই, সে যেন না আর কার লেখা, শুনেছি !"

"সে ভুল, ভুল ! তোমাদের মূর্খ অর্বাচীন ঐতিহাসিকদের ভুল।" আমি বললাম—"এতো ভারি অন্যায়, আপনার খ্যাতি চুরি করে অন্য লোকে যশস্বী হবে ?"

"তা হোকগে, তার জন্য আমি ভাবি না, আমার ভাণ্ডারে এখনও অনেক গল্প আছে, তা দিয়ে আমি দশটা সরিৎসাগর তৈরি করতে পারি, যা গেছে তার জন্য আমি দুঃখ করি না।"

banglabooks.in

এই কথা শুনে সত্যি বলছি ব্যোপদেব ঠাকুরের উপর আমার একটা অসীম ভক্তি এল। আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম—"হে গল্প লেখকদের আদিম পুরুষ, এই সামন্য গল্প লেখকের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

হঠাৎ দেখলাম বৃদ্ধের চোখদুটি আর কপালটি আরও কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর দীর্ঘ হাতখানি উপর দিকে তুলে আমায় যেন আর্শীবাদ করলেন।

টাইপরাইটার আবার খট খট করে উঠল—"তুমি গল্প লেখো ? বেশ ! বেশ ভালো ! তুমি তাহলে আমার কদর বুঝবে।"

আমি বললাম—"আপনি বুঝি এই বদ্ধ ঘরে আস্তানা নিয়েছেন—এইখানেই বুঝি থাকেন ?"

"রামঃ ! আমি এখানে থাকতে যাব কেন ? তবে একজন গল্প লেখক যখন পেলাম তখন হয়তো দিনকতক তোমার কাছে এখানে থেকে যেতেও পারি। কী বলো, থাকব নাকি ?"

আমি বললাম—"তা বেশ তো। কিন্তু সচরাচর আপনি কোথায় থাকেন ?"

—"কেন, তুমি জান না, আমরা সবাই গল্প গোলোকে থাকি—যত সব ভালো গল্প লিখিয়ে—একদিন তুমিও সেখানে আসবে নিশ্চয় ! কী বলো।"

আমি বললাম—"সে আপনার আর্শীবাদ। গল্প গোলোকে আর কে আছেন ?"

বুড়ো বলল—"আরে, কত লোক আছে ! কত নাম করব, সবাইকে আমি আবার চিনিও না। তুমি যখন আমাকেই চিনতে পারলে না, তখন আর কাকে চিনবে ?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"ইশপ সাহেবকে আপনি চেনেন ?"

—"ইশপ ? ইশপ কে ?"

—"যিনি কথামালা লিখেছেন ?"

—"ও, আমাদের ইউসুফ। চিনি বই কি, খুব চিনি। একসময়ে সে আমার শত্রু ছিল, এখন আমার পরম বন্ধু ! আহা বড় রসিক লোক, ওস্তাদ লিখিয়ে !"

banglabooks.in

আমি বললাম—"আরব্য উপন্যাস যিনি লিখেছেন তাঁকে জানেন ?"

—"আরব্য উপন্যাস ? আরবি গল্প ? খাসা গল্প হে, খাসা গল্প ! অমন গল্প আর কেউ লিখতে পারল না—পড়ে আমারও হিংসে হয়।"

—"তাঁকে দেখেছেন ?"

"দেখেছি বই কি, খুব দেখেছি ! ইয়া লম্বা সাদা দাড়ি, চোখে সুর্মা, গাল দুটি যেন পাকা দাড়িম ফেটে পড়েছে ! মুখের বুলি—আহা যেন মিঠে শরবত ! আর খোস গল্প যা করতে জানেন !" আমি বললাম—"এখনকার গল্প লেখকদের মধ্যে কারও সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি ?'

"হ্যাঁ, একজন ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বটে। শুনেছি সে নাকি 'শকুন্তলা' বলে একখানা খুব চমৎকার বই লিখেছে। চারিদিকে নাকি তার প্রশংসা ! একদিন আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল। দেখে মনে হল, হাঁ শক্তিমান পুরুষ বটে ! তবে কী জানো, ওরা সব নিতান্ত ছেলে ছোকরার দল !"

কবি কালিদাসই যখন নিতান্ত ছেলে ছোকরার দলে পড়লেন, তখন তার পরে আর কারও কথা তুলতে আমার সাহস হল না। আমি চুপ করে রইলাম।

টাইপরাইটার আবার খট খট করে উঠল—"তোমার এ কলটি তো বড় চমৎকার হে, যা খুশি তাই লেখা যায়।"

আমি বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি সুন্দর কল বেরিয়েছে। আর গল্প লেখবার কষ্ট নেই !"

—"অ্যাঁ, এই কল থেকে কি আপনিই তৈরি গল্প বার হয় নাকি ? যেমন কাপড়ের কল, আটার কল, গানের কল ?"

আমি বললাম—"আজ্ঞে না—এতে শুধু লেখা হয় মাত্র—গল্পটা মনে মনেই তৈরি করতে হয়।"

বৃদ্ধ বললেন—"তবু ভালো, আমি মনে করছিলাম হাতে লেখা গল্প উঠে বুঝি কলের গল্প চলতে আরম্ভ হয়েছে।"

আমি বললাম—"আজ্ঞে না, সে কল এখনও বার হয়নি।"

বৃদ্ধ বললেন—"দেখো বাপু তোমার এই কল দেখে আমার আবার গল্প

banglabooks.in

লেখবার সাধ হচ্ছে। আমাদের তো আর কলম নিয়ে লেখার উপায় নেই—এ দিব্যি টিপে যাব, আর লেখা হয়ে যাবে।"

আমি বললাম—"বেশ তো, আপনি লিখুন না, আমি প্রকাশ করে দেব।"

বুড়োর চোখ দুটো আবার যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—"দেবে বাবা, দেবে—প্রকাশ করে দেবে? তোমায় আর্শীবাদ করি তুমি দীর্ঘজীবি হও, যশস্বী হও।"

বৃদ্ধ একটু থেমে আবার বললেন—"এই তো আমার দুঃখ--আমিই গল্প লেখার সৃষ্টি করলাম, আর আমাকে সবাই ভুলে গেল। আমি আবার পৃথিবীকে দেখাতে চাই, আমি কত বড় গল্প লিখিয়ে! এখনও আমার সে শক্তি আছে!"

কথাগুলো বলতে বলতে টাইপরাইটারের চাবিগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। এমন করে আওয়াজ করতে লাগল যেন বুক ঠুকে ঠুকে এই কথাগুলো বলছে!

আমি বললাম—"স্বচ্ছন্দে আপনি গল্প লিখে যান, প্রকাশ করার ভার আমার রইল।"

বৃদ্ধের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম। কতখানি ব্যথা তাঁর বুকে লুকানো আছে। তাঁর সেই ব্যথার ভারে আমার বুক সমবেদনায় ভরে উঠল। মনে হল এতো আমারই কর্তব্য। বৃদ্ধের এ দুঃখ লাঘব করবার দায় আমার। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই দায় নিজের মাথায় তুলে নিলাম।

বৃদ্ধ বললেন—"তাহলে আমি লেখা আরম্ভ করি?"

আমি বললাম—"নিশ্চয় আরম্ভ করবেন।"

টাইপরাইটার দ্রুতগতিতে চলতে লাগল—"খট খট খট! খট খট খট!"—আমি শুনতে লাগলাম—"অবন্তিপুরের রাজা দিগ্বিজয় করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসছেন, সঙ্গে লক্ষ পদাতিক, দশ সহস্র অশ্বারোহী; তারা অর্ধচন্দ্রাকারে রাজাকে বেষ্টন করে অগ্রসর হচ্ছে। বাদ্যকররা উৎফুল্ল বাদ্যধ্বনি..." শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম—জানতেই পারলাম না। সকালে উঠে দেখি নিজের ঘরে, নিজের খাটিয়ার উপর শুয়ে রয়েছি। অনেক বেলা

banglabooks.in

হয়েছে, অনেকখানি রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। আমি সামনের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম সেই বন্ধ-ঘর যেমন বন্ধ ছিল, তেমনই বন্ধই রয়েছে। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম—ও ঘর থেকে আমাকে তুলে নিয়ে আমার নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল কে ? তবে কি আমি নিজেই ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছি। আর আমার টাইপরাইটার ? পাশ ফিরে দেখি টেবিলের উপর যেমন বসিয়ে রেখেছিলাম ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু তার হরফের চাবিগুলো একেবারে তেউড়ে মেউড়ে একাকার হয়ে গেছে। চাবি টিপলাম, কল চলল না। টাইপরাইটারের অবস্থা দেখে আমার কান্না আসতে লাগল। বুড়ো শেষে এই করল ! হয়তো ও ঘর থেকে তুলে আনবার সময় হাত থেকে ফেলে এই অবস্থা করেছে। হঠাৎ মনে হল বুড়ো কী গল্প লিখছে দেখি। টাইপরাইটারের গায়ে যে কাগজ আঁটা ছিল, সেখানা খুলে নিয়ে দেখলাম মাত্র একটি লাইন লেখা—অি চ ক মী র হ। এর মানে কী, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হয়তো বা কোনও ভুতুড়ে সংকেত হবে।

বসে বসে ভাবছি, এমন সময় বিনোদ এসে হাজির।—"কী রে এখনও বেড়াতে বেরসনি !" আমি বললাম—"না, আজ আর বেড়াতে যাব না। বোধ হয় বিকেলের গাড়িতেই বাড়ি ফিরব।" বিনোদ আশ্চর্য হয়ে বলল—"কেন ? কেন ?"

আমি টাইপরাইটারটা তাকে দেখিয়ে বললাম—"দেখনা কী হয়েছে ! আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেছে।"

বিনোদ টাইপরাইটারটা নেড়েচেড়ে বলল—"তাই তো রে কেমন করে এমন হল ?"

আমি কাল রাত্তিরের সমস্ত ঘটনা তাকে বলতে সে হো হো করে হেসে উঠে বলল—"ওরে, ও খোট্টাই শরবতের গুণ !"

আমি বললাম—"কাল রাত্রে যে আমি ও ঘরে গিয়েছিলাম, সে কি তুই বলতে চাও স্বপ্ন—খেয়াল ?"

বিনোদ বলল—"নিশ্চয়। ও পাশের সিঁড়ি দিয়ে না উঠে এই পাশের সিঁড়ি দিয়ে রোয়াকে উঠেছিস, আর মনে করেছিস ওই দিক দিয়েই উঠলি। তাইতে মনে হয়েছে এ ঘরে না এসে ওই ঘরে গেছিস। এ বাবা খোট্টাই শরবতের

banglabooks.in

গুণ না হয়ে যায় না।" বলে সে হাসতে লাগল। আমি চটে উঠে বললাম—"আমি যে সিঁড়ি ভুল করেছিলাম, তার প্রমাণ?"

সে বলল—"তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তুই ও ঘরে ঘুম থেকে না উঠে, এ ঘরে ঘুম থেকে উঠেছিস। আর ও ঘরের যে আসবাব পত্রের বর্ণনা করল, মিলিয়ে দেখ দেখি এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মেলে কি না। এই খাটিয়া, এই আলনা, এই তোরঙ্গ?"

এতক্ষণ যেন নিজের ঘরের কথা ভুলেই ছিলাম। বিনোদ দেখিয়ে দিতে মনে হল জিনিসগুলো মেলে বটে। কিন্তু ও ঘরেও যে এমনই জিনিস নেই তার প্রমাণ কী? বিনোদ বলল—"প্রমাণ করে দিতে পারি, যদি ও ঘরের চাবিটা কোনও রকমে খোলা যায়।"

আমি বললাম—"আর এই টাইপরাইটার? এর এমন অবস্থা কেমন করে হল? দেখছিস না বুড়ো ব্যাটা আনাড়ি হাতে টিপে টিপে এর দফ রফা করে দিয়েছে!"

বিনোদ গম্ভীর মুখে আর একবার টাইপরাইটারটার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় টেবিলের নিচে থেকে একটা মস্ত সাদা বেড়াল হাই তুলে পালাল। বিনোদ নেড়েচেড়ে টাইপরাইটারটাকে পরীক্ষা করতে লাগল। খানিক পরেই বলল—"এই হয়েছে, দেখ চাবির গায়ে বেড়ালের রোঁয়া সব জড়িয়ে রয়েছে—এ ওই বেড়ালটারই কাজ। ও টাইপরাইটারের চাবি নিয়ে খেলা করেছে, আর তুই ব্যোপদেবের খেয়াল দেখছিস।"

বিনোদ বলল বটে, বেড়ালের রোঁয়া, কিন্তু আমার মনে হল এ যেন ব্যোপদেব ঠাকুরের সেই সাদা দাড়ির একটু টুকরো। যাই হোক, এখন এর ঠিক জবাব দেওয়া যাবে না, আগে টাইপরাইটার মেরামত হোক, তারপর বুঝে নেব, ব্যোপদেব ঠাকুর গল্প লিখতে আসেন কি না।

টাইপরাইটার মেরামত না হলে আমার মন স্থির হচ্ছে না। কাজেই গল্প লেখাও এখন হবে না। অতএব এইখানেই শেষ।

banglabooks.in
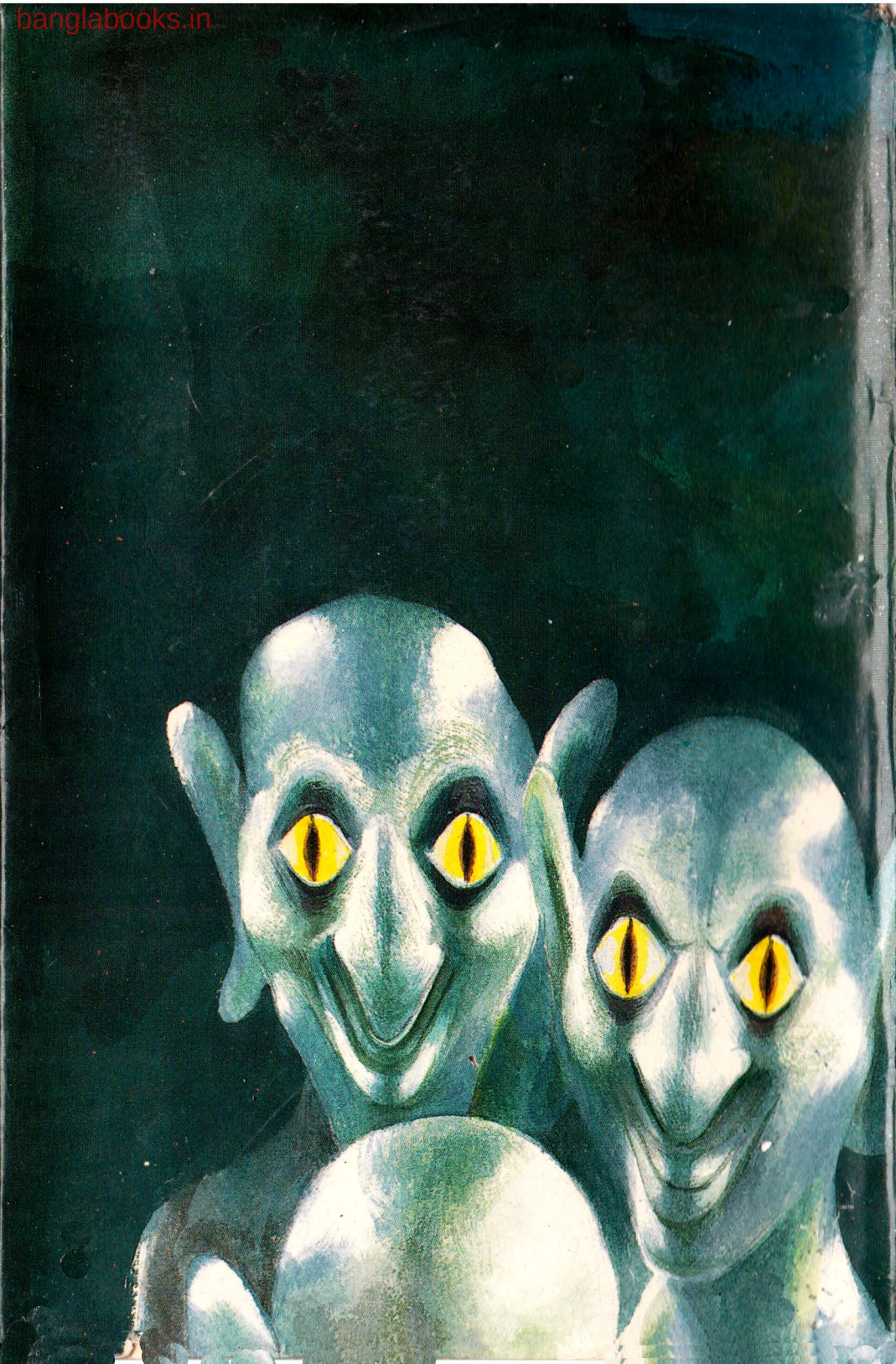
banglabooks.in